তিন গোয়েন্দা

সময়-সুড়ঙ্গ

রকিব হাসান

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা, আমি কিশোর বলছি।
যে কারণেই হোক সন্দেহ হচ্ছে,
হয়তো এ সময়ের মানুষ নই আমরা,
জন্মেছি ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে;
বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে
মহাকালকে জয় করে নিয়েছি,
রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে।
এসো, ভিড়ে পড়ো আমাদের দলে,
ঘুরে আসি ভিন্ন জগৎ থেকে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তিন গোয়েন্দা সময়-সুড়ঙ্গ রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

সময়-সুড়ঙ্গ

রকিব হাসান

grohon.com

grohon.com

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি কিশোর-কাহিনী

তিন গোয়েন্দা সিরিজ:

তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা, ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো, প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগরসৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ ১ ও ২, সবুজ ভূত, হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি, কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি, ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১ ও ২, ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব, ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল, মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর, পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ, আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ, পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল, বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১ ও ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো, প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া, ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু, পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন, পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর, প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ, ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ, খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড, বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া, খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ, ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার, চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত, জিনার সেই দ্বীপ, ঐতিহাসিক দুর্গ, ঝামেলা, কুকুরখেকো ডাইনী, নরকে হাজির, বিড়াল উধাও, ঠগবাজি, যুদ্ধঘোষণা, মারাত্মক ভুল, মঞ্চভীতি, খেলার নেশা, বিষের ভয়, দীঘির দানো, উল্কি রহস্য, নকশা, ডাকাতের পিছে, মৃত্যুঘড়ি, জলদস্যুর মোহর, শয়তানের থাবা, গুপ্তচর শিকারি, পতঙ্গ ব্যবসা, পুরানো কামান, টাকার খেলা, জাল নোট, মাকড়সা মানব, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন, বিষাক্ত অর্কিড, অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ, ভয়ঙ্কর অসহায়, সোনার খোঁজে, তুষার বন্দি, বিপজ্জনক খেলা, রাতের আঁধারে, প্রেতের ছায়া, আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, রাত্রি ভয়ঙ্কর, গোপন ফর্মুলা, সৈকতে সাবধান, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ, খেপা কিশোর, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর, তিন বিঘা, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো, গ্রেট কিশোরিয়োসো , গ্রেট মুসাইয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ, চাঁদের ছায়া, অপারেশন অ্যালিগেটর, প্রত্নসন্ধান, দুর্গম কারাগার, মানুষ ছিনতাই, নিষিদ্ধ এলাকা।

অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ:

ষড়যন্ত্র ১ ও ২, অনুসন্ধান, কালকুক্ষি, আমি টাইগার বলছি, মাকড়সার জাল।

রোমহর্ষক সিরিজ:

যাও এখান থেকে, বিষধর, নরবলি, পাগলাঘন্টী, চরমপত্র, অপারেশন বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, পলাতক, নিরুদ্দেশ, অভিশপ্ত ছুরি, নরখাদকের দেশে, শ্বেতহস্তী।

গোয়েন্দা রাজু সিরিজ:

মামার মন খারাপ, সাবাস!, বিরোধী দল, দামী কুকুর, হিপ হিপ হুররে, চকলেট কোম্পানী, নতুন হেডকোয়ার্টার, সার্কাস, খেলনা বিমান ও সোনার মেডেল, সুরের নেশা ও আজব ভূত, আজব রশ্মি, জাহাজ চুরি, নকশা পাচার, টাকের ওষুধ।

কিশোর হরর সিরিজ:

অতৃপ্ত প্রেতাত্মা, বৃক্ষমানব, অভিশপ্ত ক্যামেরা, জীবন্ত মমি, তান্ত্রিকের কবলে, পাশের বাড়ির ভূত, অদৃশ্য বন্ধু, জাদুর ঘড়ি, অলৌকিক শক্তি, নেকড়েমানব, পিরামিডের আতঙ্ক, আয়নার ওপাশে, জল্লাদের হাসি, সাগর বিভীষিকা, সেই অভিশপ্ত ক্যামেরা, ভূতুড়ে সৈকত, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, রাত্রি যখন গভীর, অগ্নিপরীক্ষা, বিপদের মুখোমুখি, আতঙ্কের রাত, ঘুমালে বিপদ, আরেক পৃথিবী, ড্রাকুলার নিঃশ্বাস, বেড়ালের কান্না, মমির অভিশাপ, বিপজ্জনক বর্ম, ডাইনীর চোখ।

এক

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল কিশোর, 'সর্বনাশ! ঠিক পাঁচটায় যেতে বলে দিয়েছে চাচী!'

একটা মুহূর্তও আর দাঁড়াল না। মলের করিডর ধরে ছুটল। অবাক হয়ে সামনে থেকে ছিটকে সরে যেতে শুরু করল বাজার করতে আসা লোকজন। উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল তাদের।

'আরে আস্তে! আস্তে!' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল মুসা। লোকজনের ভিড় ঠেলে পেছন থেকে পাশে আসতে পারছে না।

'সময়মত বাড়ি যেতে না পারলে চাচী আজ আর আমাকে আস্ত রাখবে না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'ঠিক পাঁচটায় জন্মদিনের কেক কাটবে আমার।'

'তোমার জন্মদিন! কই বলনি তো?'

'এ সব ফালতু কথা মনে থাকে নাকি ছাই...'

'জন্মদিন ফালতু হলো?'

'জন্মদিনটা ফালতু নয়, তবে অনুষ্ঠান করাটা ফালতু। স্রেফ ন্যাকামি মনে হয় আমার। চাচারও বিশেষ পছন্দ না ব্যাপারটা। মেরিচাচীরও তেমন ছিল না, কিন্তু হঠাৎ করে কি যে খেয়াল

চাপল মাথায়...'

'কিন্তু আমার জন্মদিনটা আজকে হয়ে গেলে ভাল হতো,' আফসোস করে বলল মুসা। 'টেলিস্কোপটার জন্যে বায়না ধরতে পারতাম।'

একটা টেলিস্কোপ দেখতে মলে এসেছিল দুজনে। বড় একটা মীডি টেলিস্কোপ, ৪.৫ ইঞ্চি লেন্স, এফ-৮, মোটর সংযুক্ত ইকোএটারিয়াল মাউন্ট। দারুণ জিনিস। চোখ লেগে গেছে মুসার। মাঝে মাঝেই নানা রকম বাতিকে ধরে মুসাকে, তবে থাকে না বেশিদিন। একটা গিয়ে আরেকটা ধরে। এবার ধরেছে সাইন্স ফিকশনের বাতিকে। সাইন্স ফিকশন এক্সপার্ট হতে চায়। মহাকাশ দেখার জন্যে টেলিস্কোপটা তার দরকার।

মলের পার্কিং লটে বেরিয়ে দ্রুতহাতে সাইকেলটার তালা খুলে নিল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল, 'সরি, ভাই, আগে দাওয়াত দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। যাবে নাকি কেক খেতে?'

'কিন্তু উপহার ছাড়া...'

'দুত্তোর! রাখো তোমার উপহার! এটা আরেকটা ফালতু ন্যাকামি মনে হয় আমার। জন্মদিনের দাওয়াত মানেই উপহার। কেন, খালিহাতে গেলে আনন্দ কিছু কম হয়? বরং বিড়ম্বনা কমে।'

'হয়েছে, হয়েছে, লেকচার থামাও। কিন্তু আমি একা যাব? রবিন...'

'বাড়ি গিয়ে একটা ফোন করে দেব। রবিন আর জিনা দুজনকেই। আর কাউকে বলব না। বেশি ঝামেলা করতে ইচ্ছে করছে না।'

grohon.com

'সময়মত যদি আসতে না পারে?'

'দেরি করে আসবে। কয়েক মিনিট পরে এসে কেক খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

'জলদি চলো, কেকের কথা শুনেই পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে।'

*

স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপের বেড়ায় সাইকেল দুটো ঠেস দিয়ে রাখল দুজনে। দরজা দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এল একটা বিরাট কুকুর। ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোরের গায়ে। ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল কিশোর।

'আরি, রাফি, তুই!'

জবাবে কিশোরের কাঁধে পা দুটো তুলে দিয়ে গাল চাটতে শুরু করল রাফিয়ান।

'আরে থাম থাম, গন্ধ করে দিলি তো গালটা! তোর নিঃশ্বাসে বেজায় গন্ধ লাগছে আজকে!'

'পেট খালি, অনেকক্ষণ খায়নি তো,' হাসিমুখে দরজার কাছ থেকে জবাব দিল জিনা।

'তুমিও এসেছ!'

'শুধু আমি না। রবিনও,' জিনা বলল। 'একটু আগে মেরিআন্টি ফোন করে খবরটা জানালেন। তুমি ভুলে গেলে কি হবে, তিনি ভোলেননি।'

তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রবিনের হাসিমুখ।

grohon.com

grohon.com

'ভুলবেন আর কি করে?' কিশোর বলল। 'আয়োজনটা যে তাঁরই। যাকগে, তোমরা আসাতে খুশি হয়েছি। কষ্ট করে আর ফোনটা করতে হলো না আমাকে। আর কাউকে দাওয়াত দিয়েছে নাকি চাচী? জানো?'

দরজার বাইরে বেরিয়ে এল জিনা আর রবিন।

'না, আর কাউকে বলেননি,' রবিন জানাল। 'তুমি যে খেপে যাবে, জানেন। মুসাদের বাড়িতেও করেছিলেন, পাননি। তোমার সঙ্গেই কোথাও বেরিয়েছে অনুমান করেছিলাম আমরা,' জিনার দিকে তাকাল সে একবার। 'সে-জন্যেই ওঅর্কশপে অপেক্ষা করছিলাম।'

বারান্দা থেকে ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর, 'কথা বলে কে রে! কিশোর, এলি নাকি?'

'হ্যাঁ, চাচী।'

'কোথায় গিয়েছিলি? আমি তো ভাবলাম গেলই বুঝি আজ আমার এত সাধের কেক বানানো। সেই কখন থেকে এসে বসে আছে জিনারা। জলদি আয়। মাত্র দেড় মিনিট আছে আর।'

*

'পঞ্চাশ ডলারের কম হবে না দাম,' ক্যামেরাটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বলল মুসা।

অনুষ্ঠানের পর তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে এসে বসেছে ওরা। জঞ্জালের নিচে মোবাইল হোম, তার মধ্যে গোপন আস্তানা। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকেছে। একটা লোহার মোটা পাইপ। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। সুতরাং ওদের সঙ্গে রাফিয়ানের ঢুকতেও

অসুবিধে হয়নি।

'হুঁ,' ক্যামেরাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'এখন মনে হচ্ছে জন্মদিন করে ভালই হয়েছে। এ রকম একটা জিনিস পেয়ে গেলাম।'

রবিন বলল, 'এক্স থাউজ্যান্ড। সত্যি ভাল। প্রফেশনালদের জিনিস।'

ক্যামেরাটা ফিরিয়ে দিল মুসা। স্ট্র্যাপে ভরে রাখতে রাখতে কিশোর বলল, 'একেবারে সময়মত পেয়ে গেলাম জিনিসটা। ভাবতেই পারিনি আজকে পাব...কাকতালীয় ব্যাপার।'

'প্লীজ,' তাড়াতাড়ি হাতজোড় করল মুসা, 'তোমার দুর্বোধ্য গ্রীক ভাষায় বড্ড আতঙ্ক আমার। যদি বলতেই হয় খোলামেলাভাবে বলো, যাতে রাফিও বোঝে।'

'খুফ!' নিজের নাম শুনে সচকিত হলো রাফিয়ান। ঘাড় কাত করে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে তাকাল কিশোরের দিকে।

হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জিনা। 'তুই বুঝে কি করবি? তোর কি আর হাত আছে? ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারবি না।'

ক্যামেরাটা টেবিলে রাখল কিশোর। সবার মুখের দিকে তাকাল এক এক করে। 'গতরাতের সাইন্স ফিকশন ছবিটার পর টিভিতে মহাকাশের ওপর আলোচনাটা শুনেছিলে?'

মুসা বলল, 'আমি শুনেছি।'

জিনা আর রবিন চুপ করে রইল। তারমানে ওরা টেলিভিশন খোলেনি, কিংবা খুললেও ওই চ্যানেল দেখেনি।

grohon.com

'ইউ এফ ও-র কথা বলল যে শুনেছ?'

'ভাল মত,' জবাব দিল মুসা। 'আমার অবশ্য কিছুদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, রকি বীচের আশেপাশে ফ্লাইং সসার নামে। কিছু কিছু আলামত চোখেও পড়েছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, ইনডিয়ানদের পুরানো গোরস্থানের ওপাশে লেকের কাছে কি করতে গেল ওরা? শহরে নামতে পারত। মেয়রের সঙ্গে দেখা করে বলতে পারত, আমরা ভিনগ্রহ থেকে এসেছি, তোমাদের দেশে বেড়াতে।'

'যত সহজে বলছ, ব্যাপারটা অত সোজা না,' কিশোর বলল। 'অন্য গ্রহ থেকে এসে কি করে বুঝবে পৃথিবীর মানুষ বন্ধুভাবাপন্ন কিনা? সহজে মেনে নেবে কিনা? নিরাপদ জায়গায় ওঠানামা করে আগে তাই বুঝে নিতে চেয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কি কি প্রাণী আছে, এখানকার বুদ্ধিমান প্রাণীরা কেমন, ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস, মাদার শিপটা আকাশের অনেক ওপরে রেখে সম্ভবত ছোট আকাশযান নিয়ে নেমে আসে ওরা। বড় জাহাজ কিনার থেকে অনেক দূরে ভিড়িয়ে যেমন করে বোট নিয়ে অজানা দ্বীপে নামত আগের দিনের নাবিকেরা, ভিনগ্রহবাসীরাও ছোট ছোট যান নিয়ে নেমে আসছে গবেষণা চালাতে।'

'তা তো বুঝলাম,' আর ধৈর্য রাখতে পারল না রবিন, 'কিন্তু এর সঙ্গে তোমার কাকতালীয় ব্যাপারের কি সম্পর্ক?'

'এখনও বুঝলে না? খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করেছি, ইউ এফ ও দেখতে যাব। ক্যামেরাটা পেয়ে যাওয়ায় খুব ভাল হলো। যদি সত্যি নামে, ছবি তুলে নিয়ে আসব।'

'অ, তাই বলো,' এতক্ষণে আগ্রহ দেখা গেল জিনার মধ্যে। 'কিন্তু টিভিতে আলোচনাটা আরও অনেকেই শুনেছে। তারাও যদি যায়? গিয়ে ভিড় করে?'

'গেলে যাবে।'

'আমার মনে হয় না, যেতে চাইবে,' মুসা বলল। 'ইউ এফ ও-তে ইদানীং আর অত আগ্রহ নেই লোকের। ওগুলোকে ভূতপ্রেতের মত অবাস্তব ধরে নিয়েছে। ভাবে, সাইন্স ফিকশন লেখকদের কল্পিত কাহিনী। বিজ্ঞানীরাও বেশির ভাগই ঠোঁট ওল্টান, হাতে গোণা কিছু মহাকাশ বিজ্ঞানী বাদে। যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের ধারণা, মহাকাশে অবশ্যই বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে। মহাকাশযান নিয়ে গ্রহ-গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারা।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'তোমার মত বাস্তববাদী যে ইউ এফ ও-তে বিশ্বাস করবে, ভাবতে পারিনি।'

'ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই আমার, ঠিক,' জবাব দিল কিশোর, 'কিন্তু মহাকাশটা তো আর কল্পিত নয়। সৌরজগতেরও অভাব নেই সেখানে। আমাদের সৌরজগতে যদি প্রাণী থাকতে পারে, অন্যখানে থাকবে না কেন? না বিশ্বাস করাটাই বরং এক ধরনের উন্নাসিকতা। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই আমার, এ কথাও কিন্তু কখনও বলিনি--বলেছি, বিশ্বাস করব, যদি সত্যি সত্যি চোখে দেখতে পাই। না দেখলে করব কেন? অন্যের মুখে ঝাল খেতে যাওয়ার কোন মানে নেই।'

'দেখলেও তো তুমি তখন আবার অন্য ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াবে,' টিপ্পনি কাটল মুসা।

grohon.com

'বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা তো খুঁজে বেড়াবই। ব্যাখ্যাগুলো যদি সত্যি সত্যি অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করে, বিশ্বাস না করে উপায় কি? আমার বক্তব্য পরিষ্কার: ভুতুড়ে কাণ্ড যেটা প্রমাণিত হবে-প্রমাণটা অন্য কাউকে দিয়ে নয়, আমার নিজেকে দিয়ে-এবং নিজের চোখে দেখতে পাব, সেটা নিশ্চয় বিশ্বাস করব।'

'চোখের ভুল হয় অনেক সময়,' জিনা বলল।

'তা তো হয়ই। অনেক সময় নয়, বেশির ভাগ সময়। বিশ্বাস করার আগে চোখের ভুল কিনা যাচাই করে দেখে শিওর হয়ে নেব। যাই হোক, ভূতের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব এই ইউ এফ ও। আরও নিশ্চিত হয়ে যাব, ছবি তুলতে পারলে।' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর, 'চলো না, আজই যাই।'

'হুঁ, এক্স ফাইলের মোল্ডার তাহলে তোমার মগজেও ঢুকে গেছে,' মাথা দোলাল রবিন, 'অব্যাখ্যাত রহস্য।...কিন্তু আজ যদি না নামে?'

'আজ না নামলে অন্যদিন নামবে, যদি মাদার শিপটা চলে গিয়ে না থাকে। তাহলে অন্যদিন যাব। যেতেই থাকব, যতদিন না চোখে পড়ে এবং লেকের ওপরের আকাশে ইউ এফ ও দেখা যায় এই গুজব বন্ধ না হয়। টিভিতে বলেছে, গত কিছুদিন ধরে অনেকেই নাকি রহস্যময় আলো ঘোরাফেরা করতে দেখেছে রাতের আকাশে, ছুটে যেতে দেখেছে লেকের দিকে...'

'আমিও দেখেছি,' মুসা বলল। 'উজ্জ্বল আলো ছুটে গিয়ে ভেসে রইল খানিকক্ষণ লেকের ওপর। যেন ঝুলে রইল। তারপর

নিভে গেল। এ রকম আলো আর কখনও দেখিনি আমি। যেমন দ্রুতগতি, তেমনি উজ্জ্বল।'

'কিছু তো একটা নিশ্চয় দেখা যাচ্ছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'নইলে টিভিওলারা মেতে উঠবে কেন?'

grohon.com

দুই

লেকের কাছটায় জলাভূমির পচা গ্যাসের গন্ধে ভরা। সর্বক্ষণ বিরক্ত করছে এক ধরনের ছোট ছোট পোকা। হাত দিয়ে ভুরুর ওপর থেকে সরিয়ে ঘড়ি দেখল কিশোর।

এগারোটা পঁয়তাল্লিশ। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

মুসারা কি এসে ফিরে গেল? উঁহু, তা যাবে না। ওর জন্যে অপেক্ষা করবে। ওরা এসেছিল জন্মদিনের দাওয়াত পেয়ে। রাতে ফিরতে দেরি হবে, বাড়িতে বলে আসেনি। তাই মুসা, জিনা, রবিন তিনজনেই যার যার বাড়িতে ফিরে গেছে বলে আসার জন্যে। আসতে কি দিল না ওদের?

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে লেকটা। NASA-র আরেকটা গবেষণাগার তৈরি হবে। সে-জন্যেই এত সতর্কতা। রকি বীচের ছেলেমেয়েদের ধারণা, ওই 'নাসা'র আগমনের কারণেই আজকাল রহস্যময় মহাকাশযানের আনাগোনা বেড়ে গেছে এদিকটায়। যেখানেই নাসা, সেখানেই মহাকাশযান–কথাটা তো এখন অনেকটা প্রবাদের মতই হয়ে গেছে। যতই বেড়া দেয়া হোক, কঠোর প্রহরা থাক, ছোটদের

ঠেকাতে পারে না। আগে আসত স্রেফ হাওয়া খেতে–কালেভদ্রে, ইদানীং আসে ইউ এফ ও দেখতে–এবং প্রায়ই। বেড়ার বাইরের বনের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে দেখার লোভে।

এমনিতে জায়গাটা তেমন গরম না। কিন্তু আজ গরম লাগছে।

ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। ভয়ানক অত্যাচার করছে মশার ঝাঁক, জলাভূমির খুদে মাছি, নানা রকম কিলবিলে পোকা-মাকড়, জলাভূমিটা যাদের স্বর্গরাজ্য। সন্ধ্যার পর থেকে একআধ ডিগ্রির বেশি নামেনি তাপমাত্রা। বাতাস গরম। সেই সঙ্গে আর্দ্রতা, ঘাম বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আঠা হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মুসারা এখনও আসছে না কেন? এসে কি অন্য কোথাও বসে আছে?

সন্দেহ নিরসনের জন্যে মুসা আর রবিনের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল সে। জবাব পেল না।

দূর! যখন আসে আসুক। ঝোপের মধ্যে বসে আর মশার কামড় খেতে ইচ্ছে করল না। উঠে পড়ল। সাবধানে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল প্রহরী আছে কিনা। তারপর কাঁটাতারের নিচের দিকটা উঁচু করে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল বেড়ার অন্যপাশে। এখানে ঢোকাটা বেআইনী। কেয়ার করল না সে। ইউ এফ ও দেখাটাই আসল।

বেড়ার কাছ থেকে একটা পায়েচলা পথ চলে গেছে বনের ভেতর দিয়ে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পথটা। এগিয়ে

grohon.com

চলল ওটা ধরে। মিনিট দুই হাঁটতে শেষ হয়ে গেল গাছপালা। খাড়া, একটা পাথুরে অঞ্চলে ঝপ করে নেমে গেছে এখন পথটা। নিচে লেকের চকচকে কালো পানি। দূর থেকে লাগছে আয়নার মত মসৃণ।

রাস্তা ধরে নামতে শুরু করল সে। নিচের দিকটায় কাদা। পা পিছলানোর ভয় আছে। পা ফেলতে সাবধান হলো। বেশ কঠিন হলো এগোনো। সতর্ক থাকার পরেও শেষ রক্ষা করতে পারল না। ঠিকই পা পিছলাল। সড়াৎ করে নেমে চলে গেল অনেকখানি। দুই পাশে বেরিয়ে থাকা শিকড় থাবা দিয়ে ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করল।

পাহাড়ের গোড়ায় বেরিয়ে থাকা একটা বড় পাথরের সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে থামল। পাথরে বাড়ি খেল খাপে ভরা ক্যামেরাটা। স্যান্ডেল তো আঠাল কাদায় মাখামাখি হলোই, গোড়ালি পর্যন্ত উঠে এল কাদা। জিনসের পেছনে কাদার চড়া পড়ে গেল। বাকি অংশেরও খুব কম জায়গাই আছে কাদা না লাগা। ধোয়ার সময় মেরিচাচীর মুখের অবস্থাটা কি হবে ভেবে হাসি পেল তার।

কাপড়-চোপড়, স্যান্ডেল, ঘড়ি–কোন কিছু নিয়েই মাথা ঘামাল না সে। খাপ থেকে ক্যামেরাটা খুলে দেখতে লাগল। এটার কোন ক্ষতি হলে এখন ভীষণ দুঃখ পাবে।

এমনিতে তো ভালই দেখা যাচ্ছে। যান্ত্রিক কোন ত্রুটি হয়েছে কিনা সেটা ছবি না তুললে বোঝা যাবে না।

লেকটার দিকে তাকাল। চওড়ায় আধমাইল। লম্বায় দ্বিগুণের

বেশি। আকৃতি ডিমের মত। লেকটা মানুষের তৈরি নয়। ভৌগোলিকদের ধারণা, বহুকাল আগে উল্কাপাতে জন্ম হয়েছিল এটার।

বছরের এ সময়টায় পানিতে টইটম্বুর থাকে লেক। কিনারে জন্মায় প্রচুর জলজ আগাছা আর নলখাগড়া। দিনের বেলা নানা রঙের ফড়িঙ ওড়ে, মনের আনন্দে ডানা নাচায় প্রজাপতি। রাতে এখন নেই ওরা। প্রচুর ঝিঁঝি আছে। ডেকে ডেকে কান ঝালাপালা করছে। আজ পূর্ণিমা। ভরা চাঁদের রূপালী আলোয় নিখুঁত একটা বিশাল আয়নার মত লাগছে লেকটাকে। হঠাৎ করেই কেমন অপার্থিব লাগল দৃশ্যটা কিশোরের কাছে। মনে হলো, জায়গাটা যেন পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনখানে। ইউ এফ ও দেখতে এসেছে বলেই বোধহয় এমন চিন্তা ঠাঁই পাচ্ছে মনে।

ক্যামেরাটা নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছে না সে। ঠিক আছে তো!

পৃথিবীর জন্মের শুরু থেকেই নাকি ভিনগ্রহবাসীরা নেমেছে এখানে–বইপত্র আর কিংবদন্তী বলে। আগেকার দিনে নাকি অনেকে চাক্ষুস দেখেছে ওদের। ওদের মূর্তি বানিয়ে রেখেছে, গুহার দেয়ালে ছবি এঁকে রেখেছে। ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার পর ইউ এফ ও-র বেশ কিছু ছবি তোলা হয়েছে। তবে কোনটাই তেমন স্পষ্ট নয়। একেবারে কাছে থেকে কেউ তুলতে পারেনি। হাতে যে ক্যামেরা ছিল না তা নয়, কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে তাড়াহুড়ায় ছবি তুলতে ভুলে গেছে, কিংবা বিমূঢ় হয়ে উল্টোপাল্টা ক্যামেরা ব্যবহার করেছে, যার ফলে ছবি আর ওঠেনি ঠিকমত। সে-ধরনের ভুল করতে চায় না সে। কিন্তু ক্যামেরা নিয়েই যে

grohon.com

এখন সন্দেহ!

চোখের সামনে তুলে আনল ক্যামেরাটা। লক্ষ্য স্থির করল লেকের ওপর। টিপে দিল শাটার।

ক্লিক করে শব্দটা হলো ঠিকই, কিন্তু আলো জ্বলল না। ঝিক করে উঠল না ফ্ল্যাশের তীব্র নীলচে-সাদা আলো।

ফ্ল্যাশটা গেল নাকি!

ক্যামেরাটা চোখের যতটা সামনে আনলে পরিষ্কার দেখা যায়, ততটা সামনে নিয়ে এল। শত্রুতা শুরু করল চাঁদের আলো। এক টুকরো কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ।

ধ্যাত্তুরি! নিজের ওপরই প্রচণ্ড বিরক্ত হলো সে। নামার সময় আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তাহলে পা-ও পিছলাত না, ক্যামেরাটাও নষ্ট হতো না।

আবছা অন্ধকারে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে ক্যামেরার গোলমালটা কোনখানে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। ব্যাটারি খুলে নিয়ে আবার ভরল। ফিল্ম কার্ট্রিজটা ঘোরাল একপাক। আবার টিপল শাটার। জ্বলল না ফ্ল্যাশ। নাহ্, গেলই বোধহয়!

টিপে চলল শাটারের সুইচ।

ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক! শব্দ হচ্ছে ঠিকই। আলো জ্বলার নাম নেই। তারমানে বাল্বটা গেছে।

চোখের সামনে থেকে ক্যামেরাটা সরিয়ে নিল। বড়ই হতাশ। ইউ এফ ও নামলেও আর হয়তো ছবি তুলতে পারবে না এখন। অন্যদের ভাগ্যে যা ঘটেছে, তার ভাগ্যেও তাই। কেমন

কাকতালীয় মনে হলো ব্যাপারটা।

ক্যামেরায় চোখ ছিল বলেই বিচিত্র আলোটা এতক্ষণ চোখে পড়েনি তার। বিচিত্র নীলচে কাঁপা কাঁপা আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে লেকের পানিতে। মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকাল সে। চাঁদ ঢেকে দেয়া মেঘের স্তরটা কেমন কুঁকড়ে-বুকড়ে গেছে। তাতে অন্য এক ধরনের আলোর প্রতিফলন, চাঁদের আলো নয়। চাঁদের চেয়ে অনেক কাছাকাছি, অনেক বেশি উজ্জ্বল—ফ্লোরেসেন্ট আলোর মত নীলচে-সাদা।

বরফের মূর্তির মত জমে গিয়ে তাকিয়ে রইল সে। দেখতে দেখতে মেঘের টুকরোটাকে শুষে নিল যেন সেই বিচিত্র আলো। অদ্ভুত একটা শাঙ্কব আকৃতির জিনিসের পেটের মধ্যে গলগল করে ঢুকে যাচ্ছে যেন মেঘের স্তরটা।

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা খামচে ধরল যেন কেউ। কিসের দিকে তাকিয়ে আছে? ইউ এফ ও! নাকি কোন ধরনের ভয়ঙ্কর টর্নেডো? কিন্তু টর্নেডোর আলো থাকে না। ছবি তোলার কথা মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়নি তার। শক্ত হাতে চেপে ধরল ক্যামেরাটা। উজ্জ্বল জিনিসটাকে নিশানা করল সে। শাটার বাটনে চেপে বসতে শুরু করল আঙুল। ভিনগ্রহবাসীর মুখটা উঁকি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিপে দেবে। যে রকম আলো দেখা যাচ্ছে, ভাগ্য ভাল হলে ফ্ল্যাশ ছাড়াও ছবি উঠে যেতে পারে।

ভিউফাইন্ডারের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে সে। নিঃশ্বাস বন্ধ।

হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানি। কয়েক হাজার ফ্ল্যাশ মিলেও

এত উজ্জ্বল আলো তৈরি করতে পারত না। এমন আলো আর কখনও দেখেনি সে। আলোটা ঠিক কোনখান থেকে এল তা-ও স্থির করতে পারল না।

তারপর সব অন্ধকার।

তিন

বিছানায় শুয়ে আছে বুঝতে পারল সে। কি ঘটেছিল? মনে করার চেষ্টা করল। মাথার মধ্যে ঘোরটা কাটেনি পুরোপুরি। নাইটস্ট্যান্ডে রাখা ল্যাম্পটা জ্বালার জন্যে সুইচ হাতড়াতে লাগল। ক'টা বাজে? লেকের পাড়ের পুরো ঘটনাটা কি কল্পনা ছিল?

চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখল আলোটা জ্বলছে। আরও অবাক হলো যখন দেখতে পেল বিছানাটা তার নিজের নয়। অন্য কারও বিছানায় শুয়ে আছে। এটার চাদর অনেক বেশি পরিষ্কার। ওর নিজেরটার মত এলোমেলো আর অগোছাল নয় মোটেও।

মেরিচাচীকে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কাঁদছেন।

'ওর কিছু হয়নি! কিছু হয়নি!' বিলাপের সুরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন তিনি। 'কিচ্ছু হয়নি আমার ছেলের!'

'না হলেই ভাল,' নিশ্চিত হতে পারছেন না রাশেদ পাশা। ছোট্ট ঘরটায় খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছেন গম্ভীর মুখে। 'কিন্তু, মেরি...' চুপ হয়ে গেলেন। কথাটা শেষ করলেন না। তবে কণ্ঠে অনিশ্চয়তার সুরটা স্পষ্ট।

grohon.com

grohon.com

ফিরে তাকাল কিশোর। চাচার চোখেও পানি দেখতে পেল। যেটা বড়ই দুর্লভ। রাশেদ পাশা কাঁদছেন, এটা সচরাচর চোখে পড়ে না।

ঘটনাটা কি?

চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল, হাসপাতালের কেবিনে রয়েছে।

দুজন পুলিশ অফিসারকে চোখে পড়ল। দরজার কাছে দাঁড়ানো। ডিটেকটিভ। ব্যাজ দেখে বোঝা যায়, দুজনেরই পদবী লেফটেন্যান্ট। খুব সিরিয়াস কিছু না ঘটলে ডিটেকটিভরা আসে না। ধূসর চুলওয়ালা মহিলা-ডাক্তারের সঙ্গে ফিসফাস করে কথা বলছে ওরা।

আগের সন্ধ্যার ঘটনাগুলো কল্পনায় ছায়াছবির মত ফুটতে শুরু করল তার মনে। বিনা অনুমতিতে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছিল 'নাসা'র বেড়া দেয়া সীমানার মধ্যে। নিশ্চয় জেনে গেছে পুলিশ। বেআইনী কাজ করেছে সে। সেজন্যেই এসেছে ওরা।

'চাচী,' বলতে গিয়ে বুঝতে পারল কিশোর, কি সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে গেছে তার কণ্ঠ, 'পুলিশ কেন?'

তার কপালে চুমু খেলেন মেরিচাচী। কথা বললেন না। ভাবভঙ্গিতে কিশোরের মনে হলো, কবর থেকে ফেরত আনা হয়েছে যেন ওকে।

'চাচী! এমন করছ কেন? আমার ভয় লাগছে।'

দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন রাশেদ পাশা। 'ভয় কিসের?'

'ওরা কেন?' ডিটেকটিভদের দিকে ইঙ্গিত করল কিশোর। 'কি

করেছি আমি?'

'ওসব নিয়ে ভাবিসনে,' আশ্বস্ত করলেন রাশেদ পাশা। 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওদের কাজ ওরা করতে এসেছে। তুই বিশ্রাম নে। তোর শরীর ভাল না।'

'ভাল না? কি হয়েছে?'

'সেটাই তো জানতে চাইছি আমরা,' এগিয়ে এল একজন ডিটেকটিভ।

'ঘণ্টাখানেক আগে লেকের ধার থেকে তুলে আনা হয়েছে তোকে,' চাচী জানালেন। 'বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলি।'

বেহুঁশ? মনে হলো কিছু কিছু বুঝতে শুরু করেছে কিশোর। আলোর ঝিলিকের কথা মনে পড়ল। 'বজ্রপাতের শিকার হয়েছিলাম নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে। নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে দেখল পুড়েছে কিনা। কিন্তু তার নিজের কাপড়গুলো নেই। হাসপাতালের হালকা নীল রঙের একটা গাউন পরনে।

'বজ্রপাত?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছেন মেরিচাচী। চোখে অস্বস্তি নিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে তাকালেন ডাক্তারের দিকে।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। নেম ট্যাগ-এ ডাক্তারের নাম দেখা যাচ্ছে: মিস শেলী অলরিজ।

পেন্সিল টর্চের সরু রশ্মি চোখে ফেলে দেখতে শুরু করলেন ডাক্তার। প্রথমে বাঁ'টা, তারপর ডান। মিনমিন করে কিশোর বলল, 'ভয়ানক তীব্র আলোর ঝলকানি চোখে পড়েছিল আমার। মেঘের স্তরটা যেন কেমন, একটা ফানেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল

grohon.com

রঙিন হয়ে। তারপর আর কিছু মনে নেই। কে আমাকে খুঁজে পেল?'

'নাসার দুজন মেইনটেন্যান্স ম্যান। ভোরবেলা দেখে পানির কাছে পড়ে আছিস।'

'ও!'

'এতদিন কোথায় ছিলি তুই, কিশোর?' মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন।

'এতদিন মানে!' বুঝতে পারল না কিশোর।

জবাব দিতে যাচ্ছিলেন মেরিচাচী, হাত তুলে তাঁকে নিষেধ করলেন ডক্টর অলরিজ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন, 'আজ কি বার, বলো তো?'

'কি বার!' গতকাল কি বার ছিল মনে করার চেষ্টা করল কিশোর। মাথা নাড়ল। 'বলতে পারব না!'

মেরিচাচীর মুখ দেখে মনে হলো আবার কেঁদে ফেলবেন। এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধে সান্ত্বনার হাত রাখলেন রাশেদ পাশা।

'কি বার আজ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সোম? মঙ্গল? কাল তো আমার জন্মদিন ছিল...' চুপ হয়ে গেল সে।

ডাক্তারের দিকে ফিরলেন মেরিচাচী। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? কিছু মনে করতে পারছে, কিছু পারছে না! এটা কোন্ রোগ?'

'প্লীজ, মিসেস পাশা, শান্ত হোন,' অনুরোধ করলেন ডাক্তার। 'আপনি এ ভাবে বললে ও আরও দ্বিধায় পড়ে যাবে।'

দ্বিধায় ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে কিশোর।

ওর দিকে তাকালেন ডাক্তার। নীল চোখের দৃষ্টি স্থির হলো তার চোখে। ধীরে ধীরে বললেন, 'কিশোর, শুনলে হয়তো চমকে যাবে। কিন্তু সত্যি কথাটা জানা উচিত তোমার। আজকে তোমার জন্মদিনের পরদিন নয়।'

চট করে দুই ডিটেকটিভের ওপর দৃষ্টি ঘুরে এল কিশোরের। চোখে প্রত্যাশা নিয়ে ওরাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সবার নজর এখন ওর ওপর।

'আমাকে ধাঁধার মধ্যে না রেখে আজ কি বার বলে দিলেই তো হয়,' বলল কিশোর।

'বুধবার,' জবাব দিলেন ডাক্তার। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশার দিকে তাকালেন একবার। 'এপ্রিলের বাইশ তারিখ।'

ভুল শুনল মনে হলো কিশোরের। 'কি বললেন!'

'চমকে যাবে বললামই তো,' শান্তকণ্ঠে বললেন ডাক্তার। 'এটা এপ্রিল মাস, কিশোর। প্রায় নয় মাস ধরে নিখোঁজ ছিলে তুমি!'

*

'বাড়ি যেতে চাও?' স্টেথোস্কোপটা পকেটে ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার অলরিজ। 'নাকি রাতটা এখানে কাটিয়ে যাবে? টেলিভিশনে পঞ্চাশটা চ্যানেল আছে আমাদের। যে কোন খাবার খেতে চাও, এনে দেয়া যাবে।'

কিন্তু মেরিচাচী থাকতে দিতে রাজি নন। কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বললেন, 'নিজের বিছানা ছাড়া ঘুমাতে পারে না ও।' কিশোরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

grohon.com

'আপনাদের পঞ্চাশটা, আমাদের বাড়িতে আসে পঁচাত্তরটা চ্যানেল,' কিশোর বলল।

ডাক্তার হাসলেন।

কিন্তু কিশোরের হাসি আসছে না। ডাক্তারের এক কথাতেই মাথা গরম হয়ে গেছে। নয় মাস! নিশ্চয় রসিকতা করা হচ্ছে তার সঙ্গে। এটা এপ্রিল মাস তো। হয়তো সেজন্যে। এখনই হয়তো হাসিমুখে চিৎকার করে উঠবেন ডাক্তার: এপ্রিল ফুল! এপ্রিল ফুল!

অপেক্ষা করছে কিশোর।

কিন্তু 'এপ্রিল ফুল' বললেন না ডাক্তার। কেউই বলল না। সবাই মোটামুটি গম্ভীর।

ঘরের কোণে রাখা টেলিভিশনের দিকে তাকাল কিশোর। একটা কমেডি সিরিজ হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে আওয়াজ বন্ধ করে দিতে বলল।

ঘরে ঢুকলেন লম্বা, বলিষ্ঠদেহী একজন লোক। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন বিছানার দিকে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাই, কিশোর! কেমন আছো?'

পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।

পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর, 'কি মনে হয়, স্যার, আপনার? ভাল কি থাকার কথা? নয় মাস নাকি আমি গায়েব ছিলাম?'

থমকে গেলেন ক্যাপ্টেন। হাসিটা উধাও হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। ফিরে এল আবার। 'সে-ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি আমি তোমার সঙ্গে। জবাব দেয়ার মত মনের অবস্থা আছে?'

'আছে।'

'ভেরি গুড। আমি জানতাম তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। তা ছাড়া তোমার মনের জোর...'

বাধা দিল কিশোর। 'কি জানতে চান?'

'কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে কোন ধারণা আছে তোমার? এতগুলো মাস, কোথায় ছিলে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার শুধু মনে আছে, লেকের পাড়ে ইউ এফ ও-র ছবি তুলতে গিয়েছিলাম আমি। মুসা, রবিন আর জিনারও যাবার কথা ছিল। ওরা যায়নি। যে কোন কারণেই হোক সময়মত পৌঁছাতে পারেনি। কেন পারেনি, জানি না। কারণ এরপর আর ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। পাথরে বাড়ি খেয়ে আমার ক্যামেরাটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফ্ল্যাশ জ্বলছিল না। তারপর আকাশে অদ্ভুত রঙের এক মেঘ দেখলাম। ক্যামেরা তাক করলাম সেদিকে। হঠাৎ সাংঘাতিক এক আলোর ঝিলিক! আর কিছু মনে নেই।'

'ক্যামেরা! কোন ক্যামেরা তো পাওয়া যায়নি লেকের ধারে।'

'তাহলে গেছে আরকি ওটা। যাকগে। আপনারা বলছেন নয় মাস...এতদিন একটা দামী ক্যামেরা ওখানে পড়ে থাকার কথা নয়। এমন কারও হাতে পড়েছে যে ফেরত দেয়ার মত সৎ নয়।'

'তাই হবে। তা আকাশে অদ্ভুত রঙের মেঘ দেখলে বলছ। মেঘটা কেমন?

'ফানেলের মত একটা জিনিস দেখলাম। তীব্র গতিতে ঘুরে ঘুরে তার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল মেঘের স্তর...'

'সেটা কবের কথা?'

'আমার জন্মদিন যেদিন ছিল, সেদিনকার।'

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'নয় মাস আগে। তারপর?'

'ওই যে, তীব্র আলোর ঝিলিকের কথা বললাম। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার। চোখ মেলতে দেখলাম এখানে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি। আপনারা বলছেন নয় মাস, অথচ আমার মনে হচ্ছে গতকালকের ঘটনা!'

'লেকের পাড়ে কেউ তোমাকে অনুসরণ করে গিয়েছিল? কিছু টের পেয়েছ? এমন কেউ, যে তোমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারে?'

'নাহ্!'

মুসাদের কথা মনে করে মনটা তেতো হয়ে গেল কিশোরের। যাবে বলেও কেন গেল না? ওরা সঙ্গে থাকলে হয়তো ধাঁধাটার জবাব দিতে পারত–নয় মাস কোথায় ছিল ও! কারণ ওকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে থাকলে ওরা দেখতে পেত। কিন্তু ধরে নিয়ে যাওয়াটা তো আসল কথা নয়। আসল কথা হলো, নয় মাসের কোন কিছুই মনে করতে পারছে না সে। ডাক্তার, পুলিশ, সবাই নিশ্চয় মিথ্যে বলছেন না। তারমানে নিশ্চিত বিস্মরণ ঘটেছে তার। যে জন্যে নয় মাসের কথা মনে করতে পারছে না।

একটা ছবি বের করে দেখালেন ক্যাপ্টেন। 'এই মেয়েটাকে চেনো?'

এক নজর দেখেই মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'চিনি। আমাদের ক্লাসেই পড়ে। ডানা হিউগ্রি।'

grohon.com

'তুমি নিখোঁজ হওয়ার কয়েক মাস পর এই মেয়েটাও রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গেছে। উদ্বিগ্ন বোধ করছি আমরা। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে মেয়েটার নিখোঁজ হওয়ার কোন সম্পর্ক আছে।'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'কিন্তু আমি তো কিছু জানি না! কবে হারাল?'

'গত জানুয়ারিতে। বুঝতেই পারছ, বিস্মৃত নয় মাসের কথা তোমার মনে করতে পারাটা আমাদের জন্যে অতি জরুরী। অনেক সাহায্য হতো তাতে। এমন হতে পারে, যে লোক তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই একই লোক ডানাকেও নিয়ে গেছে। কোন একটা সূত্র–যে কোন ধরনের–যদি খালি মনে করতে পারো, অনেক উপকার হতো...'

এতক্ষণে বুঝতে পারল কিশোর, ডিটেকটিভ আর পুলিশ কেন এসেছে হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করতে। নাসার সীমানায় বেআইনী ভাবে ঢুকেছিল সে, সেটা আসল ব্যাপার নয়।

'পারলে কি ভেবেছেন আমিও চুপ করে বসে থাকতাম? ওকে উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে দিতাম না? নাকি ভাবছেন, আমি যে গোয়েন্দা, এ কথাটাও ভুলে বসে আছি?'

অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। 'না, ভুলিনি...তবে তোমার মনে আছে জেনে সুখী হলাম। একটা দুশ্চিন্তা কাটল। আশা করতে পারি এখন, এ কেসে তুমি আগের মতই সাহায্য করতে পারবে পুলিশকে।'

কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না কিশোর। বিছানায় সোজা

grohon.com

হয়ে বসে ভাবতে শুরু করল। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। মগজটাকে খাটাতে খাটাতে ঘামিয়ে ফেলল। মনে করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারল না। কেবল তীব্র আলোর ঝলকানির পর অন্ধকার, তারপর হাসপাতালের বেডে জেগে ওঠা–আর কিছু না।

'সরি!' অবশেষে হতাশ ভঙ্গিতে বালিশে গড়িয়ে পড়ল আবার সে। 'একটা কথাও আমি মনে করতে পারছি না!'

*

হাসপাতালের কিছু অদ্ভুত নিয়ম-কানুন আছে। কিশোরের অন্তত সে-রকমই মনে হলো। পুরোপুরি সুস্থ মানুষকেও রোগী ভাবা যেন ডাক্তারদের স্বভাব। স্বাভাবিক মানুষের মত হেঁটে বেরোতে পারে যে, তাকেও হুইল-চেয়ার অথবা স্ট্রেচারে করে বাড়ি পাঠানোর রেওয়াজ। যেন পান থেকে চুন খসলেই ভেঙেচুরে সর্বনাশ হয়ে যাবে দেহটা। স্রেফ পাগলামি–কিশোরের ধারণা। এখান থেকে বেরোনোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, সে-জন্যেই ডাক্তারদের সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করল। সারা গা কম্বলে মুড়ে, মাথায় সাতরঙা রামধনু রঙের একখানা 'ভাঁড়ের উইগ' পরিয়ে যখন স্ট্রেচারে শুইয়ে বিদায় দেয়া হলো ওকে, লক্ষ্মী ছেলের মত মুখ বুজে থাকল। কোন্‌টা থেকে কোন্‌টা বলতে গিয়ে আবার আটকা পড়ে, এই ভয়ে চোখই মেলল না পারতপক্ষে।

তাকে মুক্ত করতে পুরো একটা ঘণ্টা গলদঘর্ম হতে হলো মেরিচাচী আর রাশেদ পাশাকে। অবশেষে চাকাওয়ালা স্ট্রেচারে করে হাসপাতালের করিডর ধরে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল

ওকে। বাঁ পাশে থাকলেন চাচা, ডান পাশে একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে চাকাওয়ালা বিছানার সঙ্গে সঙ্গে এগোলেন মেরিচাচী। এত জোরে খামচে ধরেছেন চাচী, যেন আবার ছুটে গিয়ে হারিয়ে যাবে কিশোর। কিশোরের মনে হলো, পরদিন যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা আসে কোন কারণে, চাচীর আঙুলের ছাপ স্পষ্ট খুঁজে পাবে ওরা তার হাতের চামড়ায়।

হাসপাতালের বাইরে গাড়ির কাছে পৌঁছেছে ওরা, ছায়া থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। পেশিবহুল, পেশাদার অ্যাথলেটের মত দেহ। ছয় ফুটের ওপরে ইঞ্চিখানেক হবে লম্বা, ওজন একশো নব্বই পাউন্ড, লাল ইঁটের মত চুলের রঙ। একটা হাত পেছন দিকে নিয়ে রেখেছে। কি আছে হাতে? পিস্তল?

আড়চোখে তাকিয়ে আছে কিশোর।

কাছে এসে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল অপরিচিত লোকটা। চওড়া হাসি।

'হাই!' হাসিমুখে বলল সে। 'ফিরে তাহলে এলে! তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমার জান কাবার হয়ে গিয়েছিল! কোথায় গিয়ে লুকিয়েছিলে?' কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বাঁ গাল থেকে লম্বা একটা কাটা দাগ সোজা উঠে দুই ভাগ করে দিয়েছে বাঁ দিকের ঘন ঝোপের মত কালো ভুরুটাকে।

'কে আপনি?' সতর্ক হয়ে গেছে কিশোর।

জবাব দিলেন রাশেদ পাশা, 'উনি মিস্টার মার্টিন ড্রোজার।'

'কই, কখনও নামটা শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না!' কিশোর বলল।

'পড়বে কি করে? তোমার সঙ্গে তো আর আগে পরিচয় হয়নি আমার,' হাসিমুখে বলল ড্রোজার। পেছনের হাতটা সামনে নিয়ে এল। পিস্তল নেই হাতে। এক গুচ্ছ ফুল। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে।'

'থ্যাংকস!' ফুলের তোড়াটা নিয়ে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল কিশোর। কিন্তু ফুল দিক আর যা-ই দিক, লোকটার প্রতি অস্বস্তিটা দূর হলো না তার।

গাড়িতে তোলা হচ্ছে কিশোরকে। কানে এল লোকটার কথা, চাচাকে বলছে, 'ভাতিজাকে তো পেলেন। আমার কাজও শেষ। কখনও প্রয়োজন হলে খবর দেবেন আবার।'

'তা তো নিশ্চয়। গত কয়েক মাসে অনেক করেছেন আপনি। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। টাকা-পয়সা যা পাওনা হয়েছে অফিসে এসে একদিন নিয়ে যাবেন।'

'পাওনা আর কোথায়, সবই তো প্রায় দিয়ে দিয়েছেন। ঠিক আছে, যাব একদিন। আপনার ভাতিজাকেও দেখে আসব আরেকবার।'

রাশেদ পাশার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ড্রোজার।

কয়েক মিনিটের ড্রাইভ। বাড়ি পৌঁছে গেল গাড়ি। সারাটা পথ কিশোরের সঙ্গে বকর বকর করেছেন মেরিচাচী। প্রশ্ন একটাই: ন'টা মাস সে কোথায় উধাও হয়ে ছিল?

কিন্তু ন'মাস নিয়ে আর এখন মাথা ঘামাচ্ছে না কিশোর। সেটা পরে ভাবলেও চলবে। রহস্যময় মিস্টার ড্রোজার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে। লোকটাকে মোটেও ভাল লাগেনি তার।

grohon.com

চোখের দৃষ্টিও কেমন ভয়ঙ্কর। কেউটের মত শীতল।

*

বারান্দার সামনে এসে থামল গাড়ি। সব পরিচিত। সেই আগের মতই রয়েছে। সবখানে জঞ্জাল। পুরানো বাতিল মালের স্তূপ। সব সেই আগের মতই আছে। মনে হচ্ছে গতকালকের ঘটনা।

সত্যি কি আছে? বাগানের দিকে তাকিয়ে পরিবর্তনটা চোখে পড়ল। ড্যাফোডিলগুলো পুরো ফুটেছে এখন। ন'মাস আগে ছিল না। বেড়ার ধারের আপেলের চারাটার বড় ডালটা ভাঙা। নিশ্চয় ঝড় হয়েছিল। তাতে ভেঙে পড়েছে।

দৌড়ে এল বোরিস আর রোভার। স্ট্রেচার থেকে ধরে ধরে নামাল।

ওর ফিরে আসার খবর পেয়ে গেছে মুসা, রবিন আর জিনা। বাড়ি আসছে শুনে আর হাসপাতালে যায়নি, ওঅর্কশপে অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে রাফিয়ান। গাড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এল ওরাও।

সবাই ভাল ব্যবহার করছে ওর সঙ্গে, কিন্তু দুর্ব্যবহার করে বসল রাফিয়ান। ঘাউ ঘাউ করতে করতে পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। আদরের আতিশয্য নয়। একেবারে মারমুখো ভঙ্গি। দুদিক থেকে বোরিস আর রোভার ধরে না রাখলে পড়েই যেত সে।

grohon.com

চার

'রাফি! রাফি! হলো কি তোর?' ধমকে উঠল জিনা। কিন্তু কর্ণপাত করল না কুকুরটা। কিশোরের গায়ে পা তুলে দিয়ে চিৎকার করছে, সেই সঙ্গে গর্জন। পারলে ঘাড় কামড়ে ধরে।

'রাফি আমাকে চিনতে পারছে না,' বিমূঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। হাত বাড়িয়ে মাথা চাপড়ে আদর করে দিতে চাইল।

ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে নিল রাফিয়ান। কামড়ে দিতে গেল কিশোরের হাতে।

'অ্যাই, রাফি, পাগল হয়ে গেছিস নাকি!' কখনও যা করে না সাধারণত জিনা, তাই করল; ঠাস করে এক চড় মারল কুকুরটাকে। কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনল কিশোরের গায়ের ওপর থেকে।

'এতদিন পর আমাকে দেখে বোধহয় চমকে গেছে!' হাসার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু হাসিটা যান্ত্রিক। অস্বস্তি যাচ্ছে না। কি হয়েছে রাফির? ওর সঙ্গে এমন শত্রুর মত আচরণ করছে কেন কুকুরটা?

'পাগল হয়ে গেছে নাকি কুত্তাটা!' মেরিচাচী বললেন। 'জিনা,

পাগলা কুকুরে কামড়ায়নি তো ওকে? জলাতঙ্ক!'

'না, সারাটা দিন তো আমার সঙ্গেই ছিল, তেমন কিছু তো দেখিনি,' রাফির ব্যবহারে সাংঘাতিক অবাক হয়েছে জিনা। রীতিমত কান্না পাচ্ছে তার। কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল ওঅর্কশপের দিকে। বিন্দুমাত্র বাধা দিল না রাফিয়ান, প্রতিবাদ করল না, জিনার সঙ্গে একেবারে সুবোধ বালকের আচরণ–ওর যা স্বভাব। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে কিশোরের দিকে চোখ পড়তেই আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। কিশোরের মধ্যে যেন ভূত দেখতে পেয়েছে কুকুরটা।

খটকাটা বাড়ল কিশোরের। রাফির এই অদ্ভুত আচরণের পেছনে রহস্যটা কি?

*

'আগামী কাল দেখা হবে' বলে কিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার বন্ধুরা।

কিশোরকে নিয়ে রান্নাঘরে ডিনারে বসলেন মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা। মেরিচাচী হাসপাতালে ছিলেন বলে রান্না করা হয়নি। মিস কোয়াড্রুপলও বাড়ি নেই। বোনের অসুখ, দেখতে গেছে। কাজেই শুধু স্যান্ডউইচ আর আপেল জুস দিয়ে খাওয়া সারতে হলো।

খাওয়া সেরে নিজের শোবার ঘরে চলে এল কিশোর। সব আগের মত রয়েছে। কোন জিনিস এখান থেকে ওখানে হতে দেননি মেরিচাচী। কেবল কম্পিউটারের পাশে আরও ডজনখানেক গেম-এর সি-ডি যুক্ত হয়েছে। বিল্ট-ইন ভিসিআর সহ মিনি

grohon.com

ক্যামকর্ডারটা রয়েছে আগের জায়গায়। উনত্রিশ ইঞ্চি স্ক্রীনওয়ালা বিশাল টিভি সেটটা রয়েছে ঘরের কোণে। ঝকঝক করছে, নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখার কারণে।

চাচা-চাচী দুজনেই এসেছেন ওর সঙ্গে ওর ঘরে। চাচার টেলিফোনটা ছয়বার বাজার পর বিরক্ত হয়ে কানে লাগালেন তিনি। বলে দিলেন, আপাতত ব্যবসার কথা বাদ। এ মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারবেন না তিনি।

'তোর ক্লান্ত লাগছে না, কিশোর?' মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'বেশি উত্তেজনার সময় ক্লান্তি থাকলেও সেটা টের পাওয়া যায় না,' চাচা বললেন। 'ওর আজকে ঘুম আসতেও দেরি হবে।'

'আমার খুব টায়ার্ড লাগছে,' চাচী বললেন। 'তা ছাড়া শরীরটাও ভাল নেই। দুদিন থেকে পেটের একটা পাশ ব্যথা করছে।'

'কেন?' শঙ্কিত হলো কিশোর।

'কেন আর কি? পেট কি আর ব্যথা করে না মানুষের? অ্যাসিডিটি হবে হয়তো।...আর কিছু লাগবে তোর? আমি শুতে চললাম।'

'না, লাগবে না। তুমি যাও। আমার জন্যে ভেবো না। ঘুমিয়ে পড়ব। কাল আবার স্কুলে যেতে হবে না?'

চাচী বললেন, 'পারবি যেতে?'

'কেন পারব না? তোমরা যতটা ভাবছ, তত অসুস্থ আমি নই।

ঘরে বসে থাকার চেয়ে স্কুলে গেলেই ভাল লাগবে আমার। তা ছাড়া মুসাদের সঙ্গেও দেখা হবে। ওরা তো স্কুল শেষ না করে আসতে পারবে না। বিকেল পর্যন্ত একা বাড়িতে বসে থাকব নাকি!'

'যাস্। যেতে পারলে তো ভালই।'

চাচা বললেন, 'কাজে লেগে যাওয়াই ভাল। দীর্ঘদিন কেউ অসুখে ভুগলে শরীর সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরও মনটা অসুস্থ থেকে যায়। যত তাড়াতাড়ি সেটাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা যায়, ততই ভাল।'

*

চাচার কথাই ঠিক। বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না তার। ভাবছে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম করে ফেলার জোগাড়। নয়-নয়টা মাস! এতগুলো দিন সে ছিল কোথায়? পুলিশের ধারণা—হারিয়ে গিয়েছিল। কোথায় হারিয়েছিল? অচেনা কোন জায়গায় নিশ্চয় ঘুরে বেড়িয়েছে এতগুলো দিন। পরিচিত জায়গা হলে, কেউ চিনে ফেললে অনেক আগেই তাকে বাড়ি পৌঁছে দিত।

ফিরে গেল লেকের পাড়ে জ্ঞান হারানোর আগের শেষ দৃশ্যটায়। মুসারা আসেনি। কেন আসেনি, এখন জানে সে। জিজ্ঞেস করেছে ওদের। মুসার জেলপি গাড়িতে করে রওনা দিয়েছিল তিনজনে—রবিন, মুসা আর জিনা। পথে খারাপ হয়ে যায় মুসার ভটভটি। অনেক চেষ্টা করেও সারাতে না পেরে শেষে গাড়ি ফেলে হেঁটে গিয়েছিল ওরা। তাতে অনেক দেরি হয়ে যায়। গিয়ে আর পায়নি কিশোরকে।

grohon.com

লেকের পাড়ে পিছলে পড়ে ক্যামেরাটা নষ্ট হওয়ার কথা ভাবল কিশোর।...তীব্র আলোর ঝলকানি।...তারপর অন্ধকার।...সেই আলোই নিশ্চয় স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত করে দিয়েছে তার। হুঁশ ফেরার পর রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। ঘোরের মধ্যে হাঁটছিল। কোন ট্রাক ড্রাইভার তাকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছিল হয়তো। ওর মুখ থেকে কোনও ঠিকানা উদ্ধার করতে না পেরে অচেনা কোন শহরের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিল তাকে।

কিন্তু কোন শহরেই যদি যাবে, সেই শহর থেকে ফিরে এল কি করে আবার? ফিরে এসে লেকের পাড়ে কি করতে গিয়েছিল? বেহুঁশ হলো কেন?

কেউ তাকে তুলে নিয়ে যায়নি তো?

মনে পড়ল রঙিন মেঘের কথা। ইউ এফ ও!...মনে পড়ল রাফির অদ্ভুত আচরণের কথা। কি দেখতে পেয়েছে কুকুরটা তার মধ্যে? ভূতে আসর করার কথা শুনে এসেছে এতদিন। কিন্তু তার ঘাড়ে ভূত সওয়ার হয়েছে, বিশ্বাস করতে পারছে না এ কথা। তাহলে ঘটনাটা কি?

মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। গরম হয়ে উঠল মগজ। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে খুট করে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। পিরিচ ঢাকা দেয়া গেলাসটা তুলে ঢকঢক করে গিলে ফেলল সবটুকু পানি।

বই পড়ার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। হয়তো ঠাণ্ডা হবে মাথা। কিন্তু শুধু শুধুই তাকিয়ে রইল ছাপার অক্ষরগুলোর দিকে। মন বসাতে পারল না।

বইটা রেখে দিয়ে তার চাচার স্টাডিতে এসে ঢুকল। ফাইলে অনেক কিছু লিখে রাখেন রাশেদ পাশা। ন'টা মাস কি ঘটেছে এ বাড়িতে, জানা দরকার। কোথায় গিয়েছিল সে, এ রহস্য ভেদের জন্যে কাজে লাগবে এমন কোন তথ্য পেয়েও যেতে পারে।

রাশেদ পাশার ডায়েরীটা দেখতে পেল টেবিলে। কারও ডায়েরী পড়া নীতি-বিরুদ্ধ, কিশোরও সেটা পছন্দ করে না। কিন্তু আজকে কৌতূহল সামলাতে পারল না। নয় মাসের রহস্য ভেদ তাকে করতেই হবে।

পাতা ওল্টাতে শুরু করল কিশোর। সব বিস্তারিত লেখা রয়েছে। কিভাবে বনের মধ্যে কুকুর নিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে তাকে পুলিশ। কিভাবে দিনের পর দিন সার্চ পার্টি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে তাকে লেক আর তার আশেপাশের এলাকায়। মরিয়া হয়ে খুঁজেছে তাকে মুসা, রবিন আর জিনা। ইনটারনেটে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তার ছবি, টেলিভিশনের প্রতিটি চ্যানেলের 'নিখোঁজ সংবাদ' বিভাগে বার বার প্রচার করা হয়েছিল তার নিরুদ্দেশের খবর, অনুরোধ জানানো হয়েছিল কেউ যদি দেখে থাকে খোঁজ দেয়ার। দুধের কার্টুনের পেছনে যে বিজ্ঞাপনের জন্যে জায়গা থাকে, সেখানেও দীর্ঘদিন ধরে তার ছবি এবং নিরুদ্দেশের খবর ছাপা হয়েছে। পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মেরিচাচীর কান্নাকাটি সহ্য করতে না পেরে 'ভূত-বিশেষজ্ঞ' আর জিপসি ওঝাকে পর্যন্ত ডেকে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন চাচা, অপার্থিব কোন জগতে যদি বিচরণ থেকে থাকে তাঁর ভাতিজাকে তাহলে যাতে

grohon.com

ধরে নিয়ে আসতে পারে। মোটকথা, তাকে খুঁজে বের করতে কোন উপায়ই বাদ রাখেননি চাচা।

পরিবারের মধ্যে তার যে এতটা মূল্য, জেনে মনে মনে খুশি হলো কিশোর।

পাতা উল্টে যেতে লাগল।

একটা পাতায় একটা ছবি পিন দিয়ে আটকে রাখা। ইঁটের মত লাল চুল লোকটার। বাঁ গালে কাটা দাগ। মিস্টার ড্রোজারের ছবি।

রাশেদ পাশার লেখা ক্যাপশন পড়ে জানা গেল: এই লোক একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। তারমানে গোয়েন্দা। নিজে গোয়েন্দাগিরি করতে ভালবাসেন রাশেদ পাশা, কিন্তু ভাতিজার নিরুদ্দেশে এতটাই বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন নিজের ওপরও বোধহয় আস্থা ছিল না, তাই বিপুল পরিমাণ ফিসের বিনিময়ে আলাদা গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিলেন।

পড়া শেষ করে ডায়েরীটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল কিশোর। জানা গেছে অনেক কিছু। কিন্তু এ সব থেকে তার নয় মাস গায়েব থাকার রহস্যের কোন সমাধান হলো না। ফিরে এল নিজের ঘরে। শুয়ে পড়ল বিছানায়। আলো নিভিয়ে দিল। ঘুম এল অবশেষে। তবে গাঢ় নিদ্রা হলো না। ছটফট করতে থাকল ঘুমের মধ্যেও। স্বপ্ন দেখে চলল একনাগাড়ে। দুঃস্বপ্ন।

পাঁচ

ঘুম ভাঙলে কিশোর দেখল বিছানার পাশে ঝুঁকে রয়েছেন মেরিচাচী। হাতে এক প্লেট প্যানকেক। নীল জামের রস দিয়ে তৈরি। কিশোরের প্রিয় খাবার।

'এত তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে গেছে?' আফসোস করে বলল কিশোর। 'মাত্র তো শুলাম। রাতে ঘুম হয়নি। অনেক রাতে ঘুমিয়েছি।'

'স্কুলে যাবি বললি না?' মেরিচাচী হাসলেন। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে বাস চলে যাবে। জলদি ওঠ।'

'বাসে যেতে পারব না। বাথরুম, গোসল, নাস্তা...'

'ঠিক আছে, চিন্তা নেই। আমি তোকে গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসব। সত্যি যেতে চাস স্কুলে?'

'নিশ্চয়!' লাফ দিয়ে উঠে বসল কিশোর। 'জাহান্নামে যাক ঘুম। কেটে গেছে। দরকার হলে ফিরে এসেও ঘুমাতে পারব।' বড় একটা তোয়ালে টান দিয়ে তুলে নিয়ে দৌড় দিল বাথরুমের দিকে।

হাসতে লাগলেন মেরিচাচী। এই প্রথম স্বস্তির হাসি দেখা

grohon.com

গেল তাঁর মুখে। আবার পুরানো স্বাভাবিক চরিত্রে ফিরে আসছে কিশোর, তাঁর কাছে মনে হলো। পেছনে চিৎকার করে বললেন, 'তোর স্কুলের জামা-কাপড়গুলো বের করে রাখছি আমি। ন্যাংটো হয়ে বেরোসনে আবার। তোয়ালেটা জড়িয়েই আসিস। আগের মত ছোট নেই আর এখন তুই, ভুলে যাসনে।'

আপনমনে হাসতে লাগলেন চাচী। ভাবছেন, ছেলেগুলো বড় হয়ে যায় কেন? হাফপ্যান্ট ছাড়া শুধু গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়াতে পারে যখন সেই সময়টাই তো সবচেয়ে ভাল। কিন্তু উপায় নেই। বড় তো হবেই। কল্পনায় ছোট দেখে আনন্দ পাওয়া ছাড়া করার কিছু নেই। নিজের অজান্তে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। প্লেটটা টেবিলে রেখে গিয়ে আলমারির দরজা খুললেন।

বাথরুম থেকে ফিরে এল কিশোর। অস্বস্তি বোধ করছে। এতদিন পর স্কুলে যাবে। কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে তার। রবিন আর মুসাকে একটা ফোন করে দিলে হতো না? স্কুলে ঢোকার সময় ওরা দুজন সঙ্গে থাকলে আড়ষ্টতা অনেকখানি কাটত। বেশি অস্বস্তি বোধ করছে সে অন্য কারণে–সবাই তাকে একটা প্রশ্নই করতে থাকবে: এতদিন কোথায় ছিল সে? জবাব দিতে পারবে না সে, জানা কথা। হয়তো পাগল ভাববে তাকে সহপাঠীরা। কি রকম চোখে তাকাবে।

তাকাকগে! আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে সব। অস্বস্তিটা জোর করে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল সে।

কাপড়গুলোর ওপর চোখ পড়তে হাসিটা স্থির হয়ে জমে গেল যেন তার মুখে। ওর সবুজ টী-শার্ট, নীল জিনস, টিভা

স্যান্ডেল–এগুলো পরেই তো লেকের পারে ছবি তুলতে গিয়েছিল! মেরিচাচী কোথায় পেলেন? এর একটাই জবাব, লেকের পাড়ে পড়ে থাকার সময় ওর পরনে ছিল এগুলো। চাচী ধুয়ে, ইস্ত্রি করে রেখেছেন। আরেকটা রহস্য। নয় মাসে এত নতুন থাকল কি করে পোশাকগুলো? যেন মাত্র গতকাল পরে এসে খুলে রেখেছে!

অস্বস্তিটা ফিরে এল আবার। কোনমতে বলল, 'থ্যাংকস!'

অবাক চোখে তার দিকে তাকালেন চাচী। 'থ্যাংকস কিসের?'

'এই যে জামা-কাপড়গুলো ধুয়ে ইস্ত্রি করে রেখেছ।'

'সে তো সব সময়ই রাখি,' হাসি ফুটল চাচীর মুখে। 'এত ফরমাল হলি কবে থেকে আবার? ভাল। বন্যতা যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই ভাল।'

কিন্তু চাচীর কণ্ঠ শুনে মনে হলো না, কিশোরের অগোছালো বুনো স্বভাবটা দূর হয়ে গেলে তিনি খুশি হন। তিনি তাঁর 'ছেলেকে' ঠিক আগের মতই ফেরত চান।

'জলদি রেডি হয়ে নে,' চাচী বললেন। 'আমি বোরিসকে গাড়ি বের করতে বলিগে।'

বাথরুম থেকে দাঁত মেজে আসতে ভুলে গেছে কিশোর। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে ঘষতে শুরু করল। কয়েক ঘষাতেই কাজ শেষ। বেশি ডলতে ভাল লাগে না তার। আয়নার দিকে তাকিয়ে দাঁতগুলো সব বের করে দেখল। কোনও পরিবর্তন নেই। তার আগের দাঁতগুলোই রয়েছে। তারমানে ভূতে বা ভিনগ্রহবাসীতে আসর করলেও তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। একটা বিরাট স্বস্তি।

grohon.com

শার্ট গায়ে দিল সে। প্যান্টের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিল। গেল আটকে পা'টা। ঢোকানোর জন্যে একপায়ে লাফালাফি শুরু করল। ইস্ত্রি করা কাপড় পরার এই এক ঝামেলা। কোনখানে যে কখন আটকে যাবে কেউ বলতে পারে না। স্কুলের লকারের চাবিটা তুলতে গিয়ে বিছানার পাশের নাইটস্ট্যান্ডে একটা জিনিসের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল তার।

ওর নিজের নোটবুক। শেষ পাতাটা খোলা। একটামাত্র লাইন লেখা:

ওদের সবাইকে খুঁজে বের করো; বিফল
হওয়া চলবে না।

বাক্যটার দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে থাকল সে। 'ওদের সবাই' মানে কারা? কাদের খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে? বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর। কিছু বুঝতে পারল না। তবে কেউ একজন তাকে এই নির্দেশ বা আদেশটা দিয়ে রেখেছে কোন সন্দেহ নেই তাতে।

এবং মজার ব্যাপারটা হলো, হাতের লেখাটা তার নিজের! কখন লিখেছে, মনে করতে পারল না।

*

রকি বীচ জুনিয়র হাই স্কুলের গেটের সামনে এনে গাড়ি থামালেন মেরিচাচী। হাতব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে নিজের হাতে কিশোরের এলোমেলো চুল আঁচড়ে দিলেন তিনি। হেসে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন, 'যা! অস্বস্তি লাগছে?'

'তা তো খানিকটা লাগছেই।'

'কি অবাক কাণ্ড, না? যে স্কুলটা বাড়ির চেয়ে বেশি পরিচিত ছিল তোর, সেখানে ঢুকতে এখন অস্বস্তি। সময় অনেক কিছু গোলমাল করে দেয়। যা, সমস্যা হবে না। দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।'

কিশোর নেমে যেতে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন চাচী।

যে কারণে স্কুলে আসতে অস্বস্তি বোধ করছিল, সেটাই ঘটল। গেটের ভেতর ঢুকতেই ঘিরে ধরল তাকে সহপাঠীরা। গুড় দেখে ছেঁকে ধরল যেন মাছির ঝাঁক।

'এতদিন পর স্কুলে ফিরতে কেমন লাগছে, কিশোর?' প্রথম প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল নর্টন বার্মিং নামে একটা ছেলে।

'গত নয়টা মাস কোথায় ছিলে?' ক্যারোলিন নামে একটা মেয়ের প্রশ্ন।

তারপর একসঙ্গে হই-চই শুরু করে দিল সবাই। মেশিনগানের বুলেট বর্ষণের মত একনাগাড়ে শুরু হলো যেন প্রশ্ন-বর্ষণ।

'যেখানে গিয়েছিলে সেখানে ডানা হিউগ্রিকে দেখেছ?'

'ভিনগ্রহবাসীরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল নাকি তোমাকে?'

'কে তোমাকে কিডন্যাপ করেছিল বলতে পারবে?'

'নাকি সবটাই একটা ধাপ্পাবাজি?'

অসহায় বোধ করতে লাগল কিশোর। ইচ্ছে হলো, ঘুরে ছুটে পালায়। রক্ষা করল ভারী একটা হাত। কাঁধ চেপে ধরল হাতটা। ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিস্টার রবার্টসন। 'এই, থামো তোমরা! পাগল করে দেবে নাকি ছেলেটাকে!' ধমক

grohon.com

দিতে গিয়ে নাকের ডগায় নেমে চলে আসা চশমাটা ঠেলে ওপরে তুলে দিলেন তিনি। 'যাও, সরো!'

প্রিন্সিপাল স্যারের পেছনে মুসা আর রবিনকে দেখতে পেল কিশোর। ওদের কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। বুঝতে পারল, ওরাই গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে স্যারকে।

ধমক খেয়ে সরে গেল অতি উৎসাহী ছেলেমেয়ের দল। কিশোরকে ঘিরে দাঁড়াল মুসা, রবিন আর জিনা। প্রায় এসকর্ট করে নিয়ে গেল ক্লাসের ভেতরে।

সবই চেনা, অথচ কেমন যেন অচেনা। অদ্ভুত! ক্লাসের দেয়ালগুলোও সেই একই ডিজাইনের কাগজে মোড়া দেখতে পাচ্ছে। তবু এমন নতুন নতুন লাগছে কেন তার? নয় মাস পর এলেই কি কারও এমন লাগতে পারে? আসলে নিজের মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে, ধরতে পারছে না কিশোর।

ঘণ্টা বাজল। ক্লাস টিচার মিসেস গার্টরুড ঢুকলেন। ঢুকেই নজর পড়ল কিশোরের ওপর। ছোটখাট একজন মহিলা, গায়ে হালকা রঙের সোয়েটার, আন্তরিক কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছো, কিশোর?'

হাসিটাও তাঁর স্বাভাবিক।

কিন্তু কিশোরের মনে হলো, অস্বাভাবিক। কেন লাগছে এমন? সে নিজে বদলে গেছে বলেই কি? লক্ষ করল, চব্বিশজন ছেলেমেয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। যেন মিসেস গার্টরুডের প্রশ্নের জবাবটা সকলেই শুনতে উৎসাহী।

কোনমতে জবাব দিল কিশোর, 'ভাল।' ভয়ে ভয়ে থাকল, এর পরের প্রশ্নটা না হয়: এতদিন কোথায় ছিলে?

কিন্তু সে-রকম কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না মিসেস গার্টরুড। পড়াতে শুরু করলেন।

ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ল এক সময়। বেরিয়ে গেলেন মিসেস গার্টরুড।

'রুটিন জানো তো?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো হবে এখন। মিস্টার মালভি...'

'তারমানে আগের রুটিন বদলায়নি?'

'না।'

*

সোনালি-চুলের লম্বা একজন মানুষ মিস্টার মালভি। মুখ ভর্তি দাড়ি। অভিনেতা হার্ডি ফোর-এর মত দেখতে লাগে তাঁকে। ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড থেকে পড়াতে লাগলেন তিনি। গল্পটা হলো এক বিজ্ঞানীর—একটা ভয়ানক ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন যিনি, যেটা তাঁর ভেতরের মানুষটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলত। অর্ধেক সময় তিনি থাকতেন চমৎকার একজন ভদ্রলোক, বাকি অর্ধেক সময় দানব।

ঢোলা একটা আলখেল্লা পরে এসেছেন মিস্টার মালভি। মাথায় চূড়াওয়ালা হ্যাট। জেকিল অ্যান্ড হাইড পড়ানোর সময় বিশেষ আবহ সৃষ্টির জন্যেই এ রকম পোশাক পরেছেন কিনা কে জানে। হ্যাঁ, সেটাই করেছেন। কারণ কিছুটা পড়ার পর পকেট থেকে একটা মুখোশ বের করে মুখে লাগালেন তিনি। একপাশ

স্বাভাবিক মানুষের, অন্যপাশ বিকৃত দানবের।

'বইটা অতি চমৎকার,' বলতে লাগলেন তিনি। 'সাধারণ হরর কাহিনী হিসেবেও পড়তে পারো, আবার প্রচুর চিন্তার খোরাকও পাবে এর মধ্যে।' মুখোশের ফুটোর ভেতর দিয়ে তার কথাগুলো কেমন বিকৃত হয়ে বেরোতে থাকল। 'গভীর ভাবে ভাবলে বুঝতে পারবে লেখক একই মানুষের দুই রূপ সৃষ্টি করে কি বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দুটো সত্তা থাকে। একটা ভাল, একটা খারাপ। খারাপটাকে যতক্ষণ চেপে রাখতে পারবে, ভাল থাকবে, কিন্তু বেরোতে দিলেই সর্বনাশ করে ছাড়বে সে তোমার।'

বইয়ের পাতা উল্টে আবার জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন তিনি। গল্পটা সত্যি আকর্ষণীয়। বার বার পড়া থাকা সত্ত্বেও আবার তাতে ডুবে গেল কিশোর। কিন্তু বেশিক্ষণ মনঃসংযোগ করে রাখতে পারল না। বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে মন। মগজে এক ধরনের চাপ। মাথার মধ্যে কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না।

জানালার বাইরে তাকাল। এপ্রিলের সুন্দর উষ্ণ দিন। স্কুলের কেয়ারটেকার মিস্টার অ্যাইজন লন পরিষ্কার করছে। রোদে চকচক করছে তার মস্ত টাকটা। বাতাসে ভেসে আসছে সদ্য কাটা ঘাস-পাতার গন্ধ। এর মাঝে মিস্টার মালভির কণ্ঠটা একঘেয়ে লাগছে।

বইয়ের দিকে মুখ ফেরাল কিশোর। চোখের সামনে সাঁতার কাটতে থাকল যেন ছাপার অক্ষরগুলো। মোটেও স্পষ্ট হতে চাইছে না।

মাথার মধ্যে বাড়ছে চাপটা।

একটা লাইনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আবছা হয়ে রইল লাইনটা। তারপর স্পষ্ট হতে শুরু করল। কিন্তু এ-কি লেখা! এ তো জেকিল অ্যান্ড হাইডের কথা নয়। লেখা রয়েছে:

ওদের সবাইকে খুঁজে বের করো; বিফল হওয়া চলবে না।

grohon.com

ছয়

এতটাই চমকে গেল কিশোর, আরেকটু হলেই খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। চারপাশে তাকাল। সবাই এখন স্বাভাবিক। পড়ায় মগ্ন। এমনকি জিনা, রবিন আর মুসাও তাকাচ্ছে না তার দিকে।

আবার বইয়ের পাতায় মুখ নামাল কিশোর। অদ্ভুত বাক্যটা গায়েব। সে নিজেও এখন স্বাভাবিক লেখা দেখতে পাচ্ছে। জেকিল অ্যান্ড হাইডের লেখা।

নানা রকম সম্ভাবনা মাথায় ঢুকতে আরম্ভ করল কিশোরের। বইটা, বিশেষ করে তার নিজের বইটা কোনও ধরনের 'ম্যাজিক আই'তে ছাপা বই হতে পারে, যেগুলোর লেখার দিকে একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলে তাকালে ত্রিমাত্রিক লেখা ফুটে ওঠে, ভিন্ন কিছু দেখা যায়। এদিক থেকে ওদিক থেকে, এ ভঙ্গিতে, সে-ভঙ্গিতে, নানা ভাবে দেখতে লাগল পাতাটা। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সেই অদ্ভুত বাক্যটা ফুটল না বইয়ের পাতায়।

আবার বাইরে তাকাল কিশোর। সেই একই ভাবে একমনে ঘাস কেটে চলেছে মিস্টার অ্যাইজন।

ঘণ্টা পড়ল অবশেষে।

স্বাভাবিকভাবেই শেষ হলো ক্লাসটা। সবার জন্যে স্বাভাবিক। কিশোরের জন্যে নয়। অদ্ভুত একটা বাক্য দেখতে পেয়েছে সে বইয়ের পাতায়, যা আর কেউ দেখেনি। পাগল ভাবতে পারে ওকে, সে-জন্যে রবিন, মুসা বা জিনাকেও জানাল না কথাটা।

*

'বাবাগো!' ক্যাফিটেরিয়ার টেবিলে বসতে বসতে আচমকা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ট্যাবি সুজান। 'আমাকে ধরে ফেলেছে গো! নিয়ে যাচ্ছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে! ভিনগ্রহের দানবে!'

পা দিয়ে ওর চেয়ারটা আলতো করে সরিয়ে দিল টেরিয়ার ডয়েল। মেঝেতে পড়ে গেল ট্যাবি। চিত হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল। কিছু একটা ধরে ওঠার চেষ্টা করছে। হাতে ঠেকল কেবল তার গলায় ঝোলানো থার্মোস ফ্লাস্কটা, যেটাতে মুরগীর স্যুপ ভরে নিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে টিফিনে খাওয়ার জন্যে।

খিকখিক করে হাসতে লাগল টেরি। 'থার্মোসটাই তোমার ভিনগ্রহের দানব, না ট্যাবি?'

ভাইয়ের বিরুদ্ধে টেরির সঙ্গে তাল দিতে লাগল ট্যাবির আপন যমজ ভাই ক্যাবি। সে-ও একই ভঙ্গিতে হেসে ভাইকে ইয়ার্কি মারল, 'চুপ, চুপ, ছুঁচো কোথাকার! ভেন্নারা শুনে ফেললে সর্বনাশ হবে!' আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল সে। কিশোর, মুসা আর রবিন এক টেবিলে বসেছে। জিনা ওদের সঙ্গে নেই। বেশ খানিকটা দূরে দুটো মেয়ের সঙ্গে বসেছে। কিশোরদের পাশের টেবিলে বসেছে ট্যাবি-ক্যাবি আর টেরি। 'আজকাল কতজনকে

grohon.com

কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে ভেন্নারা,' ক্যাবি বলল। ভিনগ্রহবাসীর সংক্ষিপ্ত নাম দিয়েছে ক্যাবি 'ভেন্না'।

আপন ভাই হলেও ট্যাবি আর ক্যাবি দুজন দুজনকে দেখতে পারে না। বহুকাল ধরে আছে ওরা রকি বীচ হাই স্কুলে। কিন্তু কোনদিন কোন ব্যাপারে ওদের একমত হতে দেখেনি কিশোর। ঝগড়া করতে করতে এমন পর্যায়ে চলে যায় শেষে কোন একজন স্যারকে এসে কলার চেপে দুই ভাইকে টেনে ছাড়াতে হয়। দুজন দুজনকে ঘৃণাও করে, আবার কোন্ রহস্যময় কারণে একজনের কাছ থেকে বেশি দূরেও যায় না আরেকজন। এক রকম চেহারা, এক রকম পোশাক পরে, এক ধরনের চুলের ছাঁট, একই ছবি একসঙ্গে দেখতে যায়, সিনেমা দেখার চেয়ে সিনেমার কাহিনী নিয়ে তর্ক করে বেশি, ঝগড়া করতে করতে সীটময় পপকর্ন ছিটায়; কোনভাবেই একমত হতে পারে না কাহিনীটা ভাল, না মন্দ।

'ছুঁচো কাকে বলছ?' ভুরু নাচিয়ে ভাইকে জিজ্ঞেস করল ট্যাবি।

'আহ্, থামো তো তোমরা!' ধমক লাগাল টেরি। 'নিজেরাই যদি ঝগড়া করতে থাকো, অন্যের কথা শুনবে কখন?' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'তারপর, কিশোর, স্কুলে প্রথম দিনটা কেমন লাগছে?'

অবাক কাণ্ড। কিশোরকে টিকটিকি, ছুঁচো বা বাচ্চা শার্লক জাতীয় ব্যাঙ্গ করল না আজ টেরি। নিশ্চয় কোন মতলব আছে। কায়দা করে প্রশ্ন করে হয়তো জেনে নিতে চায় গত নয়টা মাস

কিশোর কোথায় ছিল।

'ভাল,' জবাব দিল কিশোর। একটু আগে বইয়ের পাতায় দেখা বিচিত্র বাক্যটা কাঁপিয়ে দিয়েছে তাকে, ভুলতে পারছে না। টেরি বা দুই যমজ ভাইয়ের কাণ্ডকারখানা বিশেষ লক্ষ করছে না সে।

'আচ্ছা,' শান্তকণ্ঠে যেন কথার কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে টেরি বলল, 'মিস্টার মালভির ক্লাসটা কেমন লাগল তোমার? মালভিকে একটা ভাঁড় মনে হয়নি? জেকিল অ্যান্ড হাইড পড়াতে এলে এমন ভাঁড় সেজে আসার কি কোন প্রয়োজন ছিল?'

'অ্যাঁ!'

'অকারণে কিশোরকে বিরক্ত করছ তুমি, শুঁটকি,' বাধা দিল মুসা।

'ওমা, বিরক্ত করলাম কোথায়? ঠিক আছে, অত ভান-ভণিতার মধ্যে না গিয়ে আসল কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেলা যাক।' কিশোরের দিকে তাকাল টেরি। 'কিশোর, আশা করি কিছু মনে করবে না তুমি?'

'না,' কি প্রশ্ন করতে চায় বুঝে গেছে কিশোর। 'কিন্তু টেরি, সত্যি বলছি, আমি কিছু মনে করতে পারছি না। আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'বেশ,' ট্যাবি বলল, 'অন্য কথা আলোচনা করা যাক।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'অনেক দিন পর তো এলে। তোমার চোখে অন্য রকম লাগার কথা। আমার ভাই ক্যাবিকে কেমন দেখছ? এতদিনে পাগল হওয়াটা সম্পূর্ণ হয়েছে ওর, তাই

grohon.com

grohon.com

না?'

'চুপ!' চিৎকার করে ট্যাবির বাহুতে ঘুসি মারল ক্যাবি।

'অ্যাই, থামবে তোমরা!' আবার ধমক লাগাল টেরি। তারপর দুই হাতে কপাল টিপে ধরে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল, 'আসলে, আমার বিশ্বাস, কোন ধরনের ওয়ার্মহোলে ঢুকে গিয়েছিল কিশোর।'

'কি হোল?' জিজ্ঞেস না করে পারল না কিশোর।

'মহাকাশের এক ধরনের সুড়ঙ্গ। যেটার মুখটা কোনভাবে তোমার সামনে পড়ে গিয়েছিল। ঢুকে পড়েছিলে তুমি। অনেকটা ফানেলের মত। প্রথমে তীব্র আলোর ঝিলিক দেখে মানুষ। তারপর অন্ধকার। কেন, সিনেমায় দেখনি?'

ভুরু কুঁচকে টেরির দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'তোমায় বেলায় কি ঘটেছিল এ রকম কিছু?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আবার টেরি।

'ঘটেছিল,' অস্বীকার করল না আর কিশোর। টেরির কথা কৌতূহল জাগিয়েছে তার।

'হুঁ, বললাম না,' মহাবিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল টেরি, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চোখ। 'ওয়ার্মহোলের একেবারে মুখের কাছে চলে গিয়েছিলে তুমি। এক ধরনের সময়-সুড়ঙ্গ ওগুলো। মুহূর্তে যে কোন সময়ে, যে কোন জায়গায় নিয়ে চলে যেতে পারে। বুঝতে পারছি, মহাকাশ থেকে একটা সময়-সুড়ঙ্গ সেদিন নেমে চলে এসেছিল লেকের ওপর। ওটা তোমাকে গিলে ফেলেছিল। নিয়ে গিয়েছিল মহাবিশ্বের কোন নিউট্রাল জোনে, সময় যেখানে

স্থির কিংবা অনেক বেশি দীর্ঘ, পৃথিবীর সময়ের তুলনায়। হয়তো কয়েক সেকেন্ড ছিলে তুমি সেখানে, যা পৃথিবীর সময়ের হিসেবে নয় মাস। সুড়ঙ্গটা তোমাকে গিলে নিয়েছিল, কয়েক সেকেন্ড রেখে আবার উগরে দিয়েছিল–নয় মাস পার হয়ে গেছে ততদিনে। উগরে দেয়ার পর মেইনটেন্যান্স ম্যানেরা তোমাকে খুঁজে পেয়েছে লেকের কিনারে।'

টেরির দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর। সিনেমা দেখেই বলুক, আর যে ভাবেই বলুক, বড় বিশ্বাসযোগ্য করে বলছে টেরি–বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে কিশোরের। টেরির যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য। ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার কথা বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার, টেরি। যে ভাবে বলছ, ঘটনাটা যদ্দূর মনে পড়ে ওভাবেই কিন্তু ঘটেছে। আলো দেখলাম। তারপর অন্ধকার। তারপর দেখি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি।...কিন্তু তুমি জানলে কি করে এত কথা?'

ফিকফিক করে হাসল টেরি। 'মনে হচ্ছে নতুন এলে রকি বীচে? এখানে যে বাতাসের আগে কথা ছড়ায়, ভুলে গেছ? ওহ্‌হো, ভুলে তো যাবেই। তোমার তো আবার মেমরি ঠিকমত কাজ করছে না।'

টেরির বড় বড় কথা সহ্য করতে পারল না আর রবিন। 'সুড়ঙ্গটা উগরে দেয়ার পর ব্যথা পেল না কেন কিশোর?'

'ওয়ার্মহোলের মুখটা নিশ্চয় একেবারে মাটি ঘেঁষে ছিল। ফানেলের মুখের মত উপুড় হয়ে।'

'তাহলে শুধু কিশোরকেই শুষে নিল কেন? তোমার কথায়

মনে হচ্ছে সুড়ঙ্গটার শোষণ ক্ষমতা রয়েছে। লেকের পানিও সেই টানে উঠে যাওয়ার কথা।'

'হয়তো শুধু প্রাণীই সংগ্রহ করে ওই সুড়ঙ্গ।'

'ভাল কথা,' মুসা বলল, 'তাহলে লেকের অন্য প্রাণীগুলো রয়ে গেল কিভাবে? গাছপালার কথা নাহয় বাদই দিলাম। পোকা-মাকড়, ব্যাঙ, সাপ, আরও কত ধরনের প্রাণী ছিল। ওগুলো? গায়েব হলো না কেন?'

'হয়তো হয়েছে,' দমল না টেরি। 'কে গুণে দেখতে গেছে লেকের ক'টা প্রাণী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল?'

চোখা যুক্তি। জবাব দিতে পারল না মুসা।

'বুঝলাম,' রবিন দমল না, 'পোকা-মাকড় হারালেও বোঝার কোন উপায় নেই। কিন্তু সুড়ঙ্গটা হঠাৎ করে একেবারে কিশোরের গায়ের ওপর এসে খুলতে গেল কেন? আর জায়গা পেল না?'

এতক্ষণে কোণঠাসা হলো টেরি। দুই হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে রইল। জবাব খুঁজে পাচ্ছে না।

চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে রবিন।

একটা মেয়েকে আসতে দেখা গেল এ সময়। মেয়েটার লম্বা বাদামী চুল পিঠের ওপর নাচছে হাঁটার তালে তালে। পরনে কালো জিনস, পায়ে কালো কমব্যাট বুট, গায়ে কালো টি-শার্ট। খুব সুন্দরী। কাঁধে ঝোলানো বিশাল একটা কালো ব্যাকপ্যাক। রিটা গোল্ডবার্গ।

'তাকিও না,' ফিসফিস করে কিশোরকে বলল মুসা। মুসার

grohon.com

কণ্ঠে খানিকটা ভয়ের ছোঁয়াও লক্ষ করল কিশোর। 'ডাইনী রিটা!'

রিটার যে নতুন খেতাব হয়েছে, জানা ছিল না কিশোরের। নয় মাসে আর কি বদলেছে? কি কি নতুন ঘটনা ঘটেছে?

'ও আবার ডাইনী হলো কবে থেকে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হয়েছে! অদ্ভুত ক্ষমতা এসে গেছে ওর মধ্যে,' মুসা জানাল। 'বিস্ময়কর। সবাই এখন ডাইনী ভাবে ওকে।'

রবিন আর মুসার নজর রিটার দিকে। কিন্তু ট্যাবি তাকাল না সেদিকে। ভাইকে খোঁচানোর জন্যে টেরিকে বলল, 'আর একটা প্রশ্ন আছে আমার, প্রফেসর ডয়েল?'

'কি?' ভারিক্কি চালে ভুরু নাচাল টেরি।

'আচ্ছা, বলুন তো, প্রফেসর সাহেব, ক্যাবির গায়ে এত দুর্গন্ধ কেন?'

বাঘের মত ঝাঁপ দিল ক্যাবি। ট্যাবির কোলে রাখা আধখাওয়া দুধের প্যাকেটটা উল্টে ফেলে দিয়ে ভিজিয়ে দিল তার জামা-কাপড়। বেধে গেল মারামারি। ওদের থামানো এখন আর টেরির কর্ম নয়, বুঝে মানে মানে উঠে কেটে পড়ল সে।

কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল রিটা। 'কিশোর, তোমার ফোন। জরুরী। আসবে আমার সঙ্গে?'

'আমার ফোন!' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। 'কে করল?'

'জানি না।'

মুসার চোখে সন্দেহ। চোখ টিপল কিশোরকে, অর্থাৎ যেও

grohon.com

না। কিন্তু শুনল না কিশোর। রিটা সম্পর্কে এমনিতেই কৌতূহল বেড়ে গেছে তার। কথা বলার সুযোগ যখন পেয়েছে, ছাড়বে না। তা ছাড়া ফোনটা কার সেটাও দেখে আসা দরকার। রবিন আর মুসাকে ট্যাবি-ক্যাবির ঝগড়া থামাতে বলে উঠে দাঁড়াল সে।

সাত

রিটার পিছু পিছু ক্যাফিটেরিয়া থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। ছাত্রদের বেশির ভাগই লাঞ্চ করছে। বাইরে একা গাছের ছায়ায় বসে গল্পের বই পড়ছে দু'একজন, কিংবা দু'চারজন একসঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে। কিশোরের প্রতি প্রাথমিক কৌতূহলটা সকাল বেলাতেই মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে সবার। এখন আর বিশেষ তাকাচ্ছে না ওর দিকে। তাতে স্বস্তি বোধ করছে কিশোর।

রিটার পিছু পিছু হলওয়ে ধরে এগোল। নির্জন হলওয়ে। কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল রিটা। ঘুরে তাকাল।

'কই, ফোন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ফোনের কথা না বললে উঠে আসতে না তুমি। মুসাও তোমাকে আসতে দিত না।'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'তারমানে মিথ্যে কথা বলে ডেকে এনেছ। কেন?'

'কারণ আছে। খুব জরুরী। তোমাকে শুনতেই হবে।'

'আমার মাথা সত্যি খারাপ হয়েছে কিনা জানার জন্যে ডেকে এনেছ নাকি? না নয়টা মাস কোথায় ছিলাম সেটা নিয়ে খোঁচানো

আরম্ভ করবে?'

হাসল না রিটা। সিরিয়াস। গম্ভীর করে রেখেছে মুখের ভঙ্গি। 'না, তোমার মাথা খারাপ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই আমার। বরং আমার ধারণা, আমি জানি তোমার কি হয়েছে।'

'তুমি জানো!'

'হ্যাঁ, জানি,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রিটা। 'কিশোর, সত্যি সত্যি অদ্ভুত কিছু ঘটছে আমাদের এই শহরটায়। তুমি চলে যাওয়ার পর কত কিছু যে ঘটে গেছে, জানলে সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে যেতে চাইবে তোমার! কিছু একটা ঘটছে এখানে। পুলিশ জানে না, নাগরিকদের বেশির ভাগই জানে না, তোমার বন্ধু মুসা আর রবিনও জানে না; জানি মাত্র আমরা কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন ছিল ডানা। সে তো তোমার মতই রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে গেল। তোমার ভাগ্য ভাল ফিরে এসেছ, ও আসেনি।'

টেরির ওয়ার্মহোল বা সময়-সুড়ঙ্গের কথাটা চট করে খেলে গেল কিশোরের মগজে। কৌতূহল আর উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বস্তিও বোধ করল–যাক, একজন অন্তত ভাবছে না ওর মাথা খারাপ হয়েছে।

মাথার মধ্যে সেই বিচিত্র চাপটা ফিরে এল তার। রিটার দিকে তাকাতেই চাপটা বাড়ল আরও। কানের কাছে, নাকি মগজের মধ্যে কে জানে!–ফিসফিস করে যেন বলতে লাগল একটা পরিচিত কণ্ঠ: ওদের সবাইকে খুঁজে বের করো; বিফল হওয়া চলবে না! পরিচিত কণ্ঠ, অথচ চিনতে পারছে না। এ কোন ভয়াবহ সমস্যার মধ্যে পড়ল সে!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়ানো রিটাকে লক্ষ করতে লাগল সে। মনে পড়ল, ওদের ছবি সাঁটানো দেখেছে তার চাচার খসড়া ডায়রিবুকে। আশ্চর্য! রিটার ছবিও দেখেছে। অথচ গতরাতে মাথা ঘামায়নি ব্যাপারটা নিয়ে। ঘামানোর অবস্থাও অবশ্য ছিল না পুরোপুরি। কিন্তু এখন বড় আশ্চর্য লাগছে।

'ডানার কি হয়েছে, বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হয়তো পারি। তোমার কি হয়েছে, তা-ও আন্দাজ করতে পারি।'

'কি হয়েছে?'

'শুনলে চমকে যাবে। বিশ্বাসই করতে চাইবে না।'

'চমকালে চমকাব। তবু সত্যি কথাটা জানতে চাই আমি। যদি পাগল হয়ে গিয়ে থাকি, তা-ও নির্দ্বিধায় বলতে পারো।'

'না, পাগল তুমি হওনি। আচ্ছা, ডানার বাবা যে নয় বছর আগে রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, মনে আছে?'

'আছে। জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে।'

হাসি ফুটল রিটার মুখে। 'এই যে প্রমাণ করে দিলে তুমি পাগল হওনি, স্মৃতিশক্তিও নষ্ট হয়নি তোমার।'

'কিন্তু তাতে কি?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'আমার মা-ও গায়েব হয়ে গিয়েছিল ওই একই দিনে,' রিটা বলল। 'মনে পড়ে?'

'পড়ে। কিন্তু এর মধ্যে রহস্যটা কোনখানে? এতবড় আমেরিকায় বহু জায়গা থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ গায়েব হচ্ছে, নানা কারণে। তুমি কি বলতে চাও বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে যে ভাবে

grohon.com

মানুষ, প্লেন, জাহাজ গায়েব হয়ে যায়, তোমার আম্মা আর ডানার বাবাও ওভাবে গায়েব হয়ে গেছেন?'

'অনেকটা ওই রকমই। হাসির কিছু নেই এতে। আমি, সিরিয়াস, কিশোর।'

জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোর।

'গত নয়টা মাস, তুমি আর ডানা গায়েব হওয়ার পর থেকে অনেক ভেবেছি আমি। যতই ভেবেছি, ততই শিওর হয়েছি। হতে পারতাম না, যদি আমার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তনটা টের না পেতাম।'

পরিবর্তন শুনে কান খাড়া করল কিশোর। তার নিজের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে, যেটা ধরতে পারছে না সে। 'কি পরিবর্তন?'

'ভয়ঙ্কর এক ক্ষমতা!' বলেই আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিল রিটা, 'কিশোর, ইদানীং তোমার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন টের পাচ্ছো? এই যেমন হঠাৎ মাথা ধরে যাওয়া, মাথা ঘুরে ওঠা, কিংবা অন্য কোন ধরনের অনুভূতি আগে যেটা ছিল না?'

প্রশ্নটা প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল যেন কিশোরকে। 'না, তেমন কিছু না, তবে মাঝে মাঝে মাথার ভেতরে একটা চাপ...'

বলতে না বলতে চাপটা ফিরে এসেছে। মাথা ঝাড়া দিতে লাগল কিশোর।

'কোন সাংঘাতিক ক্ষমতা?' জিজ্ঞেস করল রিটা।

'যেমন?'

'যেমন! অতিলৌকিক কোন ক্ষমতা। মানুষের যেটা থাকে না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর, 'নাহ্। তেমন কোন ক্ষমতা জন্মায়নি আমার মধ্যে। বরং তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভুল শুনছি আমি। হয় মানসিক রোগের ডাক্তার দেখানো উচিত আমার, নয়তো তোমার। মনে হচ্ছে তোমার মগজেও গোলমাল হয়ে গেছে।'

'না, গোলমাল হয়নি। কি হয়েছে, জানতে চাও?'

'সেটাই তো চাইছি! এত ভূমিকা করছ কেন? বলে ফেলো না যা জানো!'

দ্বিধা করতে লাগল রিটা। তারপর বলল, 'নয়টা মাস তুমি গায়েব ছিলে, এ কথা তো সত্যি? আকাশে বিচিত্র আলো দেখেছিলে। তারপর অন্ধকার। কোথায় চলে গিয়েছিলে বলে তোমার বিশ্বাস?'

'কে-ক্কেউ আমাকে কিডন্যাপ করেছিল...'

'কিডন্যাপ করেছিল। ঠিক। কিন্তু জিম্মি করে টাকা দাবী করতে এল না কেন? ফেলে রেখে গেল কেন আবার লেকের পাড়েই, অন্য কোনখানে নয় কেন? ভেবেছ এ সব কথা?...চুপ করে আছো কেন? বলো! জবাব দাও এ সব প্রশ্নের!'

'তুমি কি বলতে চাইছ ভিনগ্রহবাসীরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে?' নিচের ঠোঁট কামড়াতে শুরু করেছে কিশোর। 'তাহলে আমার মনে থাকত। মনে থাকত, নয় মাস ইউ এফ ও-র ভেতরে ছিলাম আমি। ভিনগ্রহবাসীদের চেহারা, মহাকাশযানের ভেতরটা—সব মনে থাকত।'

মাথার মধ্যের চাপটা ভোঁতা একটা দপদপানিতে রূপ নিয়েছে

grohon.com

grohon.com

ওর।

'তোমার কেন মনে নেই, সেটা অন্য প্রশ্ন, কিশোর,' রিটা বলল। 'কিন্তু ডানাকে নিজের চোখে তুলে নিয়ে যেতে দেখেছি। একটা ইউ এফ ও-তে করে তুলে নিয়ে গেছে। ওই লেকের পাড় থেকেই। একেবারে সজাগ ছিলাম আমি। স্পষ্ট দেখেছি। চোখের ভুল বলতে পারবে না কোনমতেই।'

'তারমানে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া ডানার বাবা সুযোগ মত ফিরে এসে তাকে তুলে নিয়ে গেছে?' কণ্ঠস্বরের ব্যঙ্গের সুর ইচ্ছে করেই চাপতে গেল না কিশোর। রিটার দিকে তাকাল সে। 'তোমার মা-ও তারমানে ভিনগ্রহের মানুষ। একদিন হয়তো তোমাকেও তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি? আমার বাবা-মা এই পৃথিবীর মানুষ ছিল, একবিন্দু সন্দেহ নেই তাতে। আমাদের পেছনে লাগল কেন ভিনগ্রহবাসীরা?'

'তোমার ব্যাপারটা সম্ভবত কাকতালীয়। লেকের পাড়ে ছবি তুলতে গিয়ে ভিনগ্রহবাসীদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলে। তোমার মত বুদ্ধিমান একজন মানুষকে হাতের কাছে পেয়ে গিয়ে ছাড়তে চায়নি ওরা, নিশ্চয় কাজে লাগাতে চাইছে। তবে ডানা বা আমি যে গ্রহের মানুষ, সে-গ্রহের লোক নয় ওরা। ভূতে যে ভাবে আসর করে, ঠিক সে-ভাবে আসর করেছে তোমার ওপর।'

রাফির উদ্ভট আচরণের কথা মনে পড়ল কিশোরের। তারপরেও মানতে চাইল না রিটার কথা। 'না হেসে আর পারলাম না; বুঝলে,' জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'আমার ওপর কিসে আসর করেছে জানি না, তবে তোমার যে মাথায় গোলমাল হয়ে

গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই আর আমার। যাও, এখনও সময় আছে, ভাল কোন মানসিক রোগের ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাওগে।'

হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত উল্টে দিয়ে রিটা বলল, 'জানতাম, তোমাকে বিশ্বাস করানো এত সহজ হবে না!'

'করব, যদি প্রমাণ দিতে পারো।'

প্রমাণ! তাই তো! উজ্জ্বল হলো রিটার মুখ। দ্রুতহাতে ব্যাকপ্যাকটা খুলে নিল কাঁধ থেকে। বড় একটা সেফটিপিন বের করে বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। 'নাও। আঙুল বা শরীরের যেখানে ইচ্ছে ফুটো করে ফেলো। রক্ত বের করো। রক্তের রঙটা দেখো খালি। তাহলেই বুঝবে আমার কথা ঠিক কিনা। যদি দেখো লাল, তাহলে তুমি আমাদের দলে নও। তোমাকে সিলেক্ট করেনি ভিনগ্রহবাসীরা। আর যদি দেখো...'

মাথার মধ্যে চাপা দপদপানিটা তীব্র ব্যথায় রূপ নিয়েছে কিশোরের। কষ্ট হচ্ছে এখন খুব। সেই কথাটা মগজে বেজে চলল একনাগাড়ে: ওদের সবাইকে খুঁজে বের করো; বিফল হওয়া চলবে না!

মাথায় হাত দিলেই যেন ছুঁতে পারবে কণ্ঠের মালিককে।

পিনটা কিশোরের হাতে গুঁজে দিল রিটা। 'নাও। ফুটো করো। প্রমাণ হয়ে যাক।'

হাতের তালুতে রাখা পিনটার দিকে তাকাল কিশোর। পাগলামি মনে হচ্ছে। কিন্তু কৌতূহলও দমাতে পারছে না। তা ছাড়া রিটার অনেক কথা তার সন্দেহের সঙ্গে মিলে গেছে। যদিও

grohon.com

স্বীকার করেনি।

'বেশ,' বলে সেফটিপিনটা তুলে নিয়ে চোখা মাথাটা বুড়ো আঙুলের মাথায় চেপে ধরতে গেল কিশোর।

করিডরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। মোড়ের ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা কর্কশ কণ্ঠ, 'এই, কে কথা বলে? কোথায় তোমরা?'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রিটা। 'মিসেস জাঞ্জিবার। টহলে বেরিয়েছে। দেখে ফেললে আর রক্ষা নেই।'

দৌড়ে পালাল সে।

দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। নয় মাস ধরে স্কুলে অভ্যস্ত নয়। নাকি আর কোন কারণ আছে কে জানে! দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল সে। ছুটে পালানোর কথা মাথায় এল না।

মোড় ঘুরে বেরিয়ে এলেন মিসেস জাঞ্জিবার। ভারী শরীর। কালো চুলগুলো বনরুটির মত চূড়ো করে বেঁধেছেন। আড়ালে ছাত্ররা রসিকতা করে তাঁকে নিয়ে। বলে-মিসেস জাঞ্জিবারকে দেখলে মনে হয় শুধু বাঁদর নয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে গরুর জিনও ছিল।

এ মুহূর্তে মিসেস জাঞ্জিবারের দিকে তাকিয়ে কিশোরেরও সে-রকমই মনে হলো। যদিও ভাবনার সুযোগ পেল না। কালো কাঁচের চশমার ভেতর দিকে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি করছ? পাস আছে?'

'না,' ঢোক গিলল কিশোর। 'আমি...' হাত পেছনে নিয়ে গেছে, যাতে সেফটিপিনটা মিসেস জাঞ্জিবারের চোখে না পড়ে।

'চাচীর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। শরীরটা ভাল লাগছে না,' দেয়ালে ঝোলানো ফোনটা দেখাল সে। 'চাচীকে ফোন করে দিয়েছি, এসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

সন্দেহ ফুটল মিসেস জাঞ্জিবারের চেহারায়।

'নয় মাস ধরে গায়েব ছিলাম আমি, ম্যা'ম,' তাড়াতাড়ি বলল আবার কিশোর। 'আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি, কিশোর পাশা।'

'ও, কিশোর পাশা!' মাথা ঝাঁকালেন মিসেস জাঞ্জিবার। নরম হলো চেহারা। 'এখানে না দাঁড়িয়ে থেকে নার্সের অফিসে চলে গেলে না কেন? বসতে পারতে। শুয়েও থাকতে পারতে।'

'না, অতটা খারাপ এখনও হয়নি...এখানেই থাকতে পারব...'

বুড়ো আঙুল ফুটো হওয়ার ব্যথা টের পেল কিশোর। লুকিয়ে রাখতে গিয়ে চোখা মাথাটার খোঁচা লেগে গেছে চামড়ায়। সহ্য করে গেল। শব্দ করল না। তাহলে নতুন কৈফিয়ত দিতে হবে মিসেস জাঞ্জিবারকে। যে ভাবে ছিল হাতটা, সেভাবেই রাখল। সরিয়ে আনল না।

'ঠিক আছে, আমিও দাঁড়াচ্ছি তোমার সঙ্গে,' অবশেষে কাঁধ ঢিল করলেন মিসেস জাঞ্জিবার। 'বলা যায় না, যদি বেহুঁশ-টেহুঁশ হয়ে যাও।'

'না না, তা হব না!' বিদেয় করার জন্যে বলল কিশোর, 'চাচী কখন আসবে ঠিক নেই কিছু। আপনি চলে যান। বেশি খারাপ লাগলে আমি বরং নার্সের অফিসে চলে যাব।'

'কোন অসুবিধে নেই,' মিসেস জাঞ্জিবার বললেন। 'আপাতত

কোন্ ক্লাস নেই আমার। সেভেন্থ পিরিয়ড পর্যন্ত ফ্রি।'

মনে মনে নিজেকে গালাগাল করতে লাগল কিশোর। চাচীকে ফোন করেনি। ইস্, কেন যে মিথ্যে বলতে গেল! 'করেছে' না বলে 'করতে এসেছে' বললে এই বিপদে পড়া লাগত না এখন। অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে আর এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশা নেই। শাস্তি আজ তাকে পেতেই হবে।

অলৌকিক ঘটনাই ঘটল। হঠাৎ হলের শেষ মাথার একটা দরজা খুলে গেল। পার্কিং লটের দিক থেকে ঢুকলেন মেরিচাচী। হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না।

কাছে এসে বললেন, 'এখানে কেন? খারাপ লাগছে তোর? আমি সামনের দিকে খুঁজে এলাম। রবিন আর মুসা বলল...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খারাপই লাগছে,' জবাব দিলেন মিসেস জাঞ্জিবার। 'সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি ওকে নিয়ে। আমার নাম মিসেস জাঞ্জিবার। স্প্যানিশ পড়াই।'

'আমি মিসেস মারিয়া পাশা,' হাত বাড়িয়ে দিলেন মেরিচাচী। 'আরও আগেই চলে আসা উচিত ছিল আমার। অসুস্থ ছেলেটাকে রেখে গেছি...বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছিল...স্কুল শেষ হওয়ার আগেই তাই...'

ফোনের কথা উঠে পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'চাচী, চলো। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

'তোর বইপত্র কোথায়?'

'লকারে। ওগুলো আজ আর দরকার হবে না। হোম ওঅর্ক নেই।'

grohon.com

'ও। চল্ তাহলে।'

মিসেস জাঞ্জিবারকে ধন্যবাদ দিয়ে চাচীর সঙ্গে পা বাড়াল কিশোর।

পার্কিং লটে বেরোনোর আগে হাতটা সামনে আনল না।

রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। শুকিয়ে লেগে আছে আঙুলে। চড়চড় করছে। রঙটা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল কিশোর।

রক্তের রঙ রূপালী।

আট

'কেমন কাটল স্কুলে?' চাচী জিজ্ঞেস করলেন। শহরতলীর দিকে চলেছেন।

'ভালই,' জবাব দিল কিশোর।

'একজন ডাক্তারের খোঁজ পেয়েছি, মানসিক রোগের ডাক্তার, হিপনোটিজমে বিশেষজ্ঞ। খোঁজ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। তাঁর ধারণা, সম্মোহিত করে ডাক্তার তোর মগজ থেকে বের করে আনতে পারবে ন'টা মাস তুই কোথায় ছিলি, কি করছিলি।'

কিশোরকে জবাব দিতে না দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন চাচী। চোখে উদ্বেগ। 'তোর কি খারাপ লাগছে এখনও?'

লাগছে, কিন্তু স্বীকার করল না কিশোর। বহু কথা ঘুরপাক খাচ্ছে মগজে। সম্মোহনের কথা শুনে দুশ্চিন্তাটা বেড়েছে। ঘোরের মধ্যে ডাক্তারকে যদি বলে দেয় রূপালী রক্তের কথা? মহা অনর্থ ঘটে যেতে পারে। দেখা যাবে, হয়তো এরপর জেগে উঠেছে সে কোন সরকারী গোপন তদন্ত সংস্থার হাসপাতাল বেডে, এক্স-ফাইল এজেন্টরা হুমড়ি খেয়ে আছে তার ওপর; গিনিপিগের মত

grohon.com

তার মগজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন ডাক্তাররা, বড় বড় অসংখ্য সুচ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তার মাথায়।

নয় মাসের খোঁজ জানাটা খুবই জরুরী, কৌতূহলে ফাটছে সে জানার জন্যে, কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে না সাপ বেরোয়! যদি বেরিয়ে আসে ভয়ঙ্কর কোন সত্য?

আসে আসুক! মনকে বোঝাল সে। সব জানা দরকার। অন্ধকারে থাকার চেয়ে ভাল।

রিটার মগজ-গোলানো গল্পটার কথাও মনে পড়ল; নিজের চোখে নাকি ইউ এফ ও দেখেছে সে, ডানাকে তুলে নিয়ে যেতে দেখেছে। বিশ্বাস না করে আর উপায় নেই ওর কথা। কারণ, রিটা প্রমাণ করে দিয়েছে কিশোরের মাঝেও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে। নইলে রক্তের রঙ রূপালী হয় কি করে!

'কি ভাবছিস?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'অ্যাঁ!...না, কিছু না। আমার শরীর ভালই আছে। ডাক্তারের কাছে যেতেও আপত্তি নেই আমার।'

প্রতিটি কথা নিদারুণ মিথ্যে হয়ে কানে বাজল তার। চাচীর কাছে এ ভাবে মিথ্যে বলার জন্যে ভয়ানক খারাপ লাগতে লাগল। কিন্তু কি করবে সে?

*

বিশাল তিনতলা একটা ইঁটের বাড়ির সামনে কিশোরকে নামিয়ে দিলেন মেরিচাচী। পেটের একপাশের ব্যথাটা বেড়েছে তাঁর। ডাক্তার দেখাতে যাবেন তিনিও। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই রেখেছেন। কিশোরকে বললেন, কাজ হয়ে গেলে ওয়েইটিং রুমে

grohon.com

অপেক্ষা করতে, তিনি এসে তাকে তুলে নিয়ে যাবেন। ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগবে না তাঁর।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন চাচী। পুরানো বাড়িটা ভালমত দেখতে লাগল কিশোর। হরর লেখক স্টিফেন কিং-এর উপন্যাস থেকে যেন তুলে আনা হয়েছে গা ছমছম করা বাড়িটা। সমস্ত জানালায় ভারী কালো পর্দা টানা। পুরো বাড়িটাকে যেন ঢেকে রেখেছে ঘন আইভি লতায়।

স্লেট পাথরের গুঁড়ো বিছানো সরু রাস্তা চলে গেছে সামনের সিঁড়ির কাছে। পা ফেললেই মড়মড় শব্দ করে স্লেটের গুঁড়ো। যতই চাপ লাগে, আরও ভাঙে, আরও গুঁড়ো হয়। দুই ধারে বাগান, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা বাগান–আমাজনের জঙ্গল হয়ে আছে। সামনের সিঁড়ির ধাপগুলো দেখা যাচ্ছে না বড় বড় ঘাস আর আগাছার কারণে। ঢেকে দিয়েছে। ওই আগাছা থেকে লাফ দিয়ে যদি বিষাক্ত সাপ কিংবা বিরাট জোঁক বেরিয়ে আসে, অবাক হবে না সে।

এ কোন্ ধরনের ডাক্তার? কোনও ডাক্তারের বাড়ি এ রকম ভূতের বাড়ি হয়ে থাকতে দেখেনি আর সে।

সামনের দরজায় পিতলের বিরাট নেমপ্লেট। তাতে অনেক বড় করে লেখা:

হ্যাঙ্গামায়া জুগোজুয়ো, এম. ডি.

মাশাআল্লাহ্! মনে মনে বলল কিশোর। যেমন বাড়ি, তেমনি তার ডাক্তার। নামখানাও বেশ। দিনে দশ-পনেরোবার উচ্চারণ করলেই দম ফুরাবে। উচ্চারণের সুবিধের জন্যে নিজে নিজেই

খাটো করে নিল নামটা–ডাক্তার জগ।

ভয়ে ভয়ে হাত তুলল সে, টোকা দেয়ার জন্যে। কিন্তু পাল্লায় হাত ছোঁয়ানোর আগেই খুলে গেল সেটা। 'এসো, ভেতরে এসো, খোকা,' মিষ্টিস্বরে বললেন লম্বা একজন বৃদ্ধ। মাথায় ধবধবে সাদা চুল, এত লম্বা, পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছেন। কালচে বাদামী চোখে ইস্পাতের ছুরির ধার। মুহূর্তে মনের ভেতরটা পর্যন্ত যেন চিরে দেখে ফেলেন। 'তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা।' কিশোর জবাব দেয়ার আগেই হাতের ইঙ্গিতে তাকে ভেতরে ঢুকতে বললেন তিনি। সে ঢোকামাত্র পেছনে জোরে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লাটা।

মৃদু আলোকিত একটা সুড়ঙ্গের মত করিডর ধরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। অনেকক্ষণ পর ঢুকল একটা অফিস ঘরে। ডাক্তারের অফিস।

ঘরটা আবছা অন্ধকার। বদ্ধ বাতাস আর্দ্রতায় ভরা। জানালার সমস্ত খড়খড়ি নামিয়ে দেয়া। ঘরের বাতাসে পুরানো চামড়ার গন্ধ। চেয়ার, সোফা, সব কিছুর গদি চামড়ায় মোড়া। খড়খড়ির চারপাশে টুঁড়ে মরছে যেন সূর্যালোক, ঘরে ঢোকার পথ খোঁজার জন্যে মরিয়া। বিচিত্র এক ধরনের আলো সৃষ্টি করেছে ঘরের মধ্যে। ধুলো উড়ছে ক্রমাগত। সব জিনিসে পুরু ধুলোর আস্তরণ, ফলে নাড়া লাগলেই লাফিয়ে উঠছে। খড়খড়ি দিয়ে আসা বিচিত্র আলোতে ঝিকমিক করছে। যেন কয়েক হাজার তারা হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হওয়ার পর দুলে দুলে নিচে নামছে ওদের অসংখ্য কণিকা, রোদের আভায় জ্বলছে হীরার কণার মত।

grohon.com

এই আলো-আঁধারি চোখে সয়ে আসতে সময় লাগল কিশোরের। দেখল বিশাল একটা খোদাই করা কাঠের টেবিল ফেলে রাখা হয়েছে একধারে, ঘরের প্রায় অর্ধেকটাই ভরে গেছে তাতে। ডেস্কের সঙ্গে আকার মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা চেয়ার। কালচে চামড়ায় মোড়া। ফায়ারপ্লেসের ওপরে দেয়ালের গায়ে ইচ্ছে করে তৈরি করা একটা মস্ত ফাটলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কতগুলো পিতলের যন্ত্রপাতি, মৃদু আলোয় ভোঁতা আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওগুলো থেকে। জিনিসগুলো কি, চিনতে পারল না কিশোর। ভাল করে দেখার জন্যে এগোতে গেল সেদিকে।

'দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠলেন ডাক্তার।

এতটাই চমকে গেল, কিশোরের মনে হলো ফুটখানেক লাফিয়ে উঠে গেছে শূন্যে।

মজা পেয়ে হাসলেন ডাক্তার। 'ভয় পেয়েছ? পাওয়ার কিছু নেই। স্যাংটাম স্যাংটোরামে প্রবেশ করার আগে আমাদের পরিচয়টা হওয়া জরুরী। স্যাংটাম স্যাংটোরাম হলো আমার এই প্রাইভেট অফিস, যেখানে আমি বিশেষ রোগীদের দেখি। তোমার মত রোগী। তুমি যে কিশোর পাশা, জানি আমি; কিন্তু আমি যে ডক্টর জগ, সেটা কি জানো?'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'জানি!'

'অর্থাৎ নিজে নিজেই সহজ করে নিয়েছ,' হাসিটা মুছল না ডাক্তারের। 'সবাই তা-ই করে। উপায় কি? বাবা এত জটিল একখান নাম রেখে দিয়েছিল, ছেলেবেলা থেকেই সেটা নিয়ে বিপদে পড়তে হয়েছে আমাকে। বেশির ভাগই আমাকে জগ বলে

ডাকত। ভাগ্যিস মুগোমুয়ো নয় আমাদের পদবী, তাহলে মগ ডাকা শুরু করে দিত। এবং বলাবাহুল্য, সেটা ভাল লাগত না আমার।'

'জগ আপনার ভাল লাগে?'

'তা লাগে না। তবে মগের চেয়ে ভাল। হ্যাং নামটা চালু করতে পারতাম, কিন্তু সেটাও আমার ভাল লাগে না। হ্যাং বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফাঁসিতে ঝোলানো আমার লাশ...থাকগে, নাম নিয়ে কি এসে যায়। ডক্টর জগ বললেই তো চেনা যাচ্ছে; আমাকেই চিনবে, অন্য কাউকে না।'

'তা বটে!' মনে মনে বলল কিশোর। এ মুহূর্তে মনে হলো জগের সঙ্গে বেশ মিল ডাক্তার জগের। কেবল পিঠে একটা রিঙের মত হাতল লাগিয়ে দিলেই হয়ে যায়।

মুচকি হাসলেন ডাক্তার। 'কি ভাবছ, বলি? আমার পিঠে হাতল লাগানোর কথা।'

ভড়কে গেল কিশোর। এ লোকের সামনে কোন কথা ভাবাই নিরাপদ নয়। থট রীডার নাকি? হিপনোটিজমে বিশেষজ্ঞ যখন, হতেও পারেন। মাথা ঝাঁকাল কিশোর। অস্বীকার করল না কি ভাবছিল।

'গুড বয়। সত্যবাদী ছেলেদের আমি পছন্দ করি। তাহলে আর কোন সমস্যা নেই তো? আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল আমাদের। এখনও নার্ভাস বোধ করছ?'

'নার্ভাস নই, তবে উদ্বিগ্ন,' জবাব দিল কিশোর। 'আর কখনও এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়িনি তো। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে।

grohon.com

সামলে নিতে পারব।'

'নিশ্চয়,' মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'তুমি সাহসী ছেলে। বুদ্ধিমান তো বটেই। হিপনোটিজমে নার্ভাস হওয়ার বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তারচেয়ে পেট-কাটা অপারেশন অনেক বেশি ভয়ের। হিপনোটিজম ল্যাটিন শব্দ, এর মানে হলো "ঘুম"। আমি যখন তোমাকে সম্মোহিত করব, একটা গভীর শরীর ঢিল করে দেয়া অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাব তোমাকে, যেখানে তোমার ইনার মাইন্ড–মানে, যেটাকে সহজ ভাষায় অবচেতন মন বলা হয়–সেটা শান্তিতে, সহজে কথা বলতে পারবে আমার সঙ্গে। এটা পুরোপুরি বিজ্ঞান। এরমধ্যে অলৌকিক কিছু নেই, জাদুবিদ্যা নেই।'

শুনতে খারাপ লাগছে না কিশোরের। কিন্তু ভয় আর কাটে না। যদি মন্দ কিছু জেনে ফেলেন ডাক্তার? অশুভ কিছু?

'কিশোর, শোনো, সম্মোহিত হবে কি হবে না পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করছে তোমার ইচ্ছের ওপর,' ডাক্তার বললেন। 'যদি সম্মোহিত হতে না চাও, কেউ তোমাকে সম্মোহিত করতে পারবে না।'

ভারী দম নিল কিশোর। মনে মনে বলল, আমি সম্মোহিত হতে চাই না। কিন্তু হওয়াটাও জরুরী। হয়তো ডানার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে ন'টা মাস আমি কোথায় ছিলাম সেটা জানার ওপর।

'বেশ,' দম ছাড়ল কিশোর, 'আমি রেডি।'

হাসলেন আবার ডাক্তার। 'রেডি? ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বক্সিং প্র্যাকটিস করা যায়, সম্মোহিত হওয়া যায় না। ওই কাউচটায় গিয়ে শুয়ে পড়ছ না কেন লম্বা হয়ে? তাহলে চেষ্টা করে দেখতে

পারি আমি। এখানে এমন কিছুই ঘটবে না বা ঘটানো হবে না যা তুমি চাও না। সহজ কথায়, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছু করা হবে না।'

'বেশ, তা-ই যাচ্ছি,' লম্বা কাউচটার দিকে তাকাল কিশোর। 'খানিকটা যুদ্ধং-দেহী মনোভাব যে নিয়ে রেখেছি মনে মনে অস্বীকার করব না। কি করব? মন যে বিরোধিতা করছে। ঠিক আছে, শুয়ে পড়ছি। দেখি কি হয়।'

কাউচটায় বসে পড়ল সে। আরামদায়ক, নরম গদি। দ্বিধা করল না আর। আধশোয়া হলো কাউচটায়।

ছোট আলমারি খুলে একটা ভিডিও ক্যামেরা আর ট্রাইপড বের করে আনলেন ডাক্তার। ক্যামেরাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। দামী জিনিস। খুব অস্পষ্ট ছবিও তুলে নেবে।

স্ক্রুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যামেরাটা ট্রাইপডে বসালেন ডাক্তার। 'এটা দেখে কি কোন বিরূপতা হচ্ছে তোমার?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন। 'পুলিশ অনুরোধ করেছে আমাকে। বলেছে তোমাকে সম্মোহিত করার পর পুরো ঘটনাটার একটা সচল ছবি ধরে রাখতে। ইচ্ছে করলে না করে দিতে পারো তুমি। তাহলে আর তুলব না। পুলিশ কোন সূত্র পাক বা না পাক, সেটা তাদের ব্যাপার, তোমার কিছু না।'

'না, তুলুন,' কিশোর বলল। সূত্র তারও দরকার। নয় মাসের বিস্মরণের রহস্যটা তাকে ভেদ করতেই হবে। খারাপ যদি কিছু ঘটিয়েও থাকে সে, তদন্তে সেটা বেরিয়ে আসবে। আসুক। জেনে গেলে মনের অস্বস্তিটা অন্তত দূর হবে। রহস্যের এই জটিল

গোলক-ধাঁধায় ঘুরে মরতে চায় না আর।

ক্যামেরায় একটা মিনি ক্যাসেট ভরলেন ডাক্তার। বোতাম টিপতে চালু হয়ে গেল ক্যামেরা। নীরব ঘরটায় ক্যাসেট ঘোরার খড়খড় শব্দটা বড় বেশি জোরাল হয়ে কানে বাজতে লাগল।

'ঘরে ঢুকেই আমার সংগ্রহের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলে তুমি,' ফায়ারপ্লেসের ওপরে রাখা জিনিসগুলোর দিকে নির্দেশ করলেন ডাক্তার। 'এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ ওগুলো?'

'পাচ্ছি,' জবাব দিল কিশোর।

'ওগুলো কি জিনিস, জানো?'

'না,' ঘুম ঘুম লাগতে আরম্ভ করেছে কিশোরের।

'নাবিকদের জিনিস। ওসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে সাগরে দিক-নির্দেশনার কাজ করত ওরা। নিশ্চয় বুঝতে পারছ, ওগুলো অনেক প্রাচীন জিনিস। জানো, সে আমলে রেডিও ছিল না, টেলিফোন ছিল না। ধরা যাক তুমি নাবিক। ডাঙা থেকে শত শত মাইল দূরে খোলা সাগরে যদি পথ হারাতে তখন, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে।' জিনিসগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। একটা যন্ত্রে হাত রাখলেন, 'এগুলোর নাম জানতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এটা হলো সেক্সট্যান্ট,' একটা সূর্যঘড়ির সঙ্গে যুক্ত ছোট একটা টেলিস্কোপের মত যন্ত্রে হাত রাখলেন তিনি। 'এর নাম অ্যাস্ট্রোল্যাব। বিশেষ ধরনের যন্ত্র, সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিযানগুলোতে এ জিনিস ব্যবহার করত সে-যুগে ওলন্দাজ নাবিকরা।'

grohon.com

ফাটলের মত তাক থেকে সবচেয়ে জটিল দেখতে একটা যন্ত্র তুলে নিলেন তিনি। কাঁচের বাক্সে রাখা একসারি সোনার তৈরি দোলক। 'এটা কি জানো? আমার সবচেয়ে প্রিয় সংগ্রহ। ম্যারিন ক্রোনোমিটার বলে একে। আকাশে মেঘ থাকলে যখন সূর্য পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যেত, কিংবা আঁধার রাতে যখন কোন কিছু দেখেই সময় নির্ধারণের উপায় থাকত না, তখন এটা দেখে সময় বুঝতে পারত সাগরে পথ হারানো নাবিক। এটা কার জিনিস জানো? স্বয়ং ক্যাপ্টেন জেমস কুকের, আঠারো শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বড় নাবিক ছিলেন তিনি।'

দোলা দিয়ে বাক্সের ভেতরের দোলকগুলোকে নাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার। দুলতে লাগল ছোট ছোট বলগুলো। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মনে হচ্ছে ঘুমের অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। না! মনের ভেতরে কি যেন চিৎকার করে উঠল তার। না না, এ হতে পারে না! আবার শোনা গেল চিৎকার। প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে তার ওপর ডাক্তারের কণ্ঠ, কণ্ঠের সেই মোহজাল ছিন্ন করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে।

'মহাসাগরে পথ হারিয়েছ তুমি, তাই না, কিশোর?' বলে চলেছেন ডাক্তার। 'কোথা থেকে এসেছ তুমি, তার কিছুই জানো না। কোথায় ছিলে, তা-ও জানো না। তবে কোন না কোনখানে তো ছিলে...অনিশ্চিত কোন জায়গা!'

অবচেতন মনে আতঙ্ক যেন আকুলি-বিকুলি শুরু করে দিল কিশোরের। ঠেলে বেরোনোর চেষ্টায় পাগল হয়ে উঠেছে। শান্ত হয়ে কাউচে পড়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পিছলে

grohon.com

সরে যাচ্ছে কোথায় যেন…দূরে…বহুদূরে…মাথার মধ্যে একটা চাপ তৈরি হচ্ছে।…ডক্টর জেকিল অ্যান্ড হাইডের মত আরেকটা দ্বিতীয় সত্তা যেন ফুঁসে উঠছে, আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছে…

'তোমাকে সেইখানে নিয়ে যেতে চাইছি আমি, কিশোর,' মায়াময় কণ্ঠে বলে চলেছেন ডাক্তার। 'তোমার সেই আসল জায়গাটাতে, যেখানে পড়েছিলে ন'টি মাস।'

মগজের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল: 'না, না যেও না! যেও না সেখানে…জানার কোন প্রয়োজন নেই তোমার কোথায় ছিলে তুমি…তোমাকে যে কাজ দেয়া হয়েছে সেটা শেষ করো…!'

প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল যেন মগজের দ্বিতীয় সত্তাটা। চোখের সামনে ঘোলাটে হয়ে আসছে সব। ভয়ঙ্কর…ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করল যেন সে।

নয়

জ্ঞান ফিরলে টের পেল কিশোর বেদম গতিতে চলছে তার হৃৎপিণ্ড, ফেটে বেরিয়ে আসবে যেন। গুটিসুটি কুকুর কুণ্ডলী হয়ে আছে। মাংসপেশীগুলো টানটান। চিতার মত লাফ দিতে প্রস্তুত।

বাতাসে ভাপসা গন্ধ। বদ্ধ জায়গায় যেমন থাকে।

মগজটা এখনও ঘোলাটে হয়ে আছে। স্পষ্ট চিন্তা করতে পারছে না কিছু।

কি ঘটেছে মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু স্মৃতিশক্তি সেই আগের মতই বিশ্বাসঘাতকতা করল। কিছুই মনে পড়তে দিল না। ঘন কালো পর্দায় ঢাকা পড়ে গেছে যেন সব।

সাবধানে চোখ মেলল সে। অন্ধকার। আবছা একফালি আলো চোখে পড়ছে কেবল। ধীরে ধীরে বুঝতে পারল একটা আলমারিতে ঢুকে বসে আছে সে। বোকা হয়ে গেল। আলামারিতে ঢুকেছে কেন?

স্পষ্ট মনে করতে পারল না কিছু। তবে মনে হলো, কারও হাত থেকে বাঁচার জন্যে এখানে এসে লুকিয়েছে। কার হাত থেকে? নিশ্চয় আলমারির বাইরেই আছে এখন সেই লোক।

grohon.com

পায়ের শব্দ কানে এল।

অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল সে, একটা কিছু খুঁজে বের করতে চাইল যেটা দিয়ে বাধা দিতে পারে। একটা ঝাড়ুর হাতল ঠেকল আঙুলে। আর মেঝে পরিষ্কার করার একটা ব্রাশ। একটা ক্যান। আক্রমণকারীর মুখে ওগুলো ছুঁড়ে মারলে কেমন হয়? কাজ হবে? ভাল একজন গোয়েন্দা এ মুহূর্তে কি করত–পোয়ারো কিংবা শার্লক হোমস–ভাবার চেষ্টা করল।

হ্যাঁচকা টানে খুলে গেল আলমারির দরজা। তীব্র আলো পড়ল মুখে।...সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।

'ভালই আছো মনে হচ্ছে!' ফিরে তাকিয়ে বোধহয় সহকারীদেরই বললেন তিনি। 'এই যে এখানে!'

হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'ধরো। বেরিয়ে এসো।'

পুলিশ দেখে জীবনে এত খুশি আর হয়নি কখনও কিশোর। এতটা স্বস্তি বোধ করেনি। ক্যাপ্টেনের হাত ধরে বেরিয়ে এল আলমারি থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরনের পোশাকগুলোর অনুভূতিটা বিচিত্র। এমন কেন লাগছে? ভাল করে দেখল। টি-শার্টটা ছিঁড়ে ফালাফালা। জিনসের প্যান্টও নানা জায়গায় ছেঁড়া। যেন অনেক বেড়ে গিয়েছিল তার শরীর, টান লেগে ছিঁড়েছে। বহু লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে। অনেকের হাতে শপিং ব্যাগ।

শপিং ব্যাগ! চারপাশে তাকিয়ে দেখল সে। পরিচিত দৃশ্য। চলমান সিঁড়ি, দোকানের সামনে কাঁচের সুসজ্জিত উইন্ডো,

ঝলমলে আলো।

মলে রয়েছে সে! ডাক্তার জগের অফিস থেকে কম করে হলেও দশ মাইল দূরে। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সে। বিমূঢ়ের মত জিজ্ঞেস করল, 'আমি এখানে কি করে এলাম, ক্যাপ্টেন?'

হৃৎপিণ্ডের গতি অনেকটা কমে এসেছিল তার, আবার বেড়ে যাচ্ছে।

'ওসব নিয়ে ভাবার দরকার নেই এখন,' কোমল কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'শান্ত হও। বাড়ি চলো আগে। আমাদেরও অনেক প্রশ্ন আছে।'

*

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসে জানালেন ক্যাপ্টেন, 'তোমার সঙ্গে যখন ডাক্তারের কথা চলছে, জোর করে কেউ ঢুকে পড়েছিল তাঁর অফিসে। ডাক্তারকে মারধর করেছে সে। জায়গাটাকে তছনছ করে দিয়েছে। অফিসের অবস্থা দেখলে মনে হয়, একটা দৈত্য ঢুকে পড়েছিল।'

ফায়ারপ্লেসের ওপরের তাকে রাখা নাবিকদের পুরানো যন্ত্রপাতিগুলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের। খুব পছন্দ হয়েছিল তার। ওগুলোও নিশ্চয় নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। 'ডাক্তার কি বললেন?'

'তিনি কিছু বলতে পারেননি,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। 'সাংঘাতিক জখম হয়েছেন। বেহুঁশ অবস্থায় পেয়েছি তাঁকে। বেঁচে যে গেছেন এ-ই বেশি।...কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি? তুমি কিছু মনে করতে পারছ?'

grohon.com

'নাহ্!' কোন কিছুরই জবাব নেই তার কাছে-নিজেকে গাধা মনে হচ্ছে কিশোরের! ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, একটা সময় তুখোড় গোয়েন্দা ছিল সে। 'আমার মনের গুদামটা পুরোপুরি ফাঁকা। কি যে হয়েছে আমার, নিজেও বুঝতে পারছি না। ডাক্তারের ওপর যখন হামলা হলো, জেগে উঠলাম না কেন তা-ও বুঝতে পারছি না।'

'সেটা অস্বাভাবিক নয়,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'তোমাকে তখন সম্মোহিত করে রাখা হয়েছিল।'

আঙুল মটকাল কিশোর। নিজের অজান্তে চিমটি কাটল একবার নিচের ঠোঁটে। 'আমার সঙ্গে কথা বলার সময়কার দৃশ্যটা ভিডিও করে রাখছিলেন ডাক্তার। ক্যামেরাটা চেক করেছেন?'

'করেছি,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'অফিসের জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে বটে, তবে সব আছে-পাওয়া যায়নি কেবল একটা জিনিস, ওই ভিডিওটেপের ক্যাসেটটা। কোন কথাই হয়তো জানতে পারতাম না আমরা, ডাক্তারের পড়শী ভদ্রলোক যদি দেখে না ফেলতেন। লম্বা, ফ্যাকাশে চামড়ার একটা লোককে তিনি ডাক্তারের অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। ডাক্তারের গাড়ি নিয়ে শহরের দিকে চলে গিয়েছিল লোকটা। গাড়িটা খুঁজে পেয়েছি আমরা শপিং-মলের বাইরে। একটা লোককে নেমে দৌড়ে মলে ঢুকে পড়তে দেখেছে এক দোকানদার। সেই লোকটাকে খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম তোমাকে। হতে পারে জিম্মি হিসেবে তোমাকে তুলে নিয়ে এসেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে তোমাকে ফেলেই পালিয়েছে।'

লম্বা, ফ্যাকাশে চামড়ার লোক! ভাবনাটা যেন ঝাঁকি দিয়ে গেল কিশোরকে। মনে হলো, লোকটাকে চেনে সে। কোথাও দেখেছে।

'কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি তার?' বিড়বিড় করল কিশোর। 'মোটিভ? ডাক্তারকে মেরেধরে আমাকে তুলে নিয়ে আসার কারণ?'

'সেটা জানলে তো অনেক রহস্যেরই সমাধান হয়ে যেত।'

ইয়ার্ডের গেটে পৌঁছল গাড়ি। ব্রেক কষলেন ক্যাপ্টেন। গাড়ি থামিয়ে স্টিয়ারিং থেকে সরিয়ে আনলেন হাত। কিশোরের দিকে তাকালেন। 'একটা কথাই মনে হচ্ছে আমার, কেউ একজন চায় না তোমার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসুক; চায় না গত নয় মাসে তুমি কি করেছ সেটা জানাজানি হয়ে যাক।'

*

ঘর অন্ধকার। দরজায় তালা দেয়া। মনে হচ্ছে বাড়ি নেই কেউ। বোরিস আর রোভার ডিউটি শেষ করে চলে গেছে। চাচা-চাচীও নেই। তবে একা কোন অসুবিধে হবে না, ক্যাপ্টেনকে বলল কিশোর। বরং একাই থাকতে চাইছে কিছুক্ষণ। ভাবতে চাইছে।

ক্যাপ্টেন তাকে নামিয়ে দিয়ে সাবধানে থাকতে বলে চলে গেলেন। ঘরে না ঢুকে বারান্দায় বসে রইল কিশোর। গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল।

রিটা তাকে অদ্ভুত যে সব কথা বলেছে-সেগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে আর পারল না। কারণ তার নিজের রক্তের রঙও বদলে গেছে। এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। রক্তের রঙ রূপালী! কে কবে শুনেছে মানুষের রক্তের এমন রঙ হয়?

grohon.com

ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা করতে না পেরে রক্তের কথা বাদ দিয়ে ডাক্তারের অফিসে কি ঘটেছিল সেটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল সে। কে হামলা চালিয়েছিল ডাক্তারের অফিসে? তাকে খুন করতে এসেছিল, নাকি শুধুই কিডন্যাপ করতে? কিডন্যাপার কি পৃথিবীবাসী, না ভিনগ্রহের? ভাবনাটা আর পাগলামি মনে হচ্ছে না কিশোরের এখন, রিটার কথা শোনার পর।...লোকটা যে গ্রহের বাসিন্দাই হোক, ডাক্তারের অফিসে দেখামাত্র তাকে খুন করল না কেন? তাকে খুন করলেই তো নয়টা মাস সে কোথায় ছিল, কি করেছিল, সেটা চিরকালের জন্যে চাপা পড়ে যেত।

ভাবনাই সার হলো–কোন প্রশ্নের জবাব তো পেলই না কিশোর, মাথাটা বরং গরম হতে থাকল। সূত্র দরকার তার, সূত্র! সূত্র ছাড়া কোন প্রশ্নের জবাব বের করতে পারবে না। কোনও একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা বলেছিল, এ মুহূর্তে নামটা মনে করতে পারল না সে–যেখানে রহস্যের শুরু, সেখানেই গিয়ে সূত্র খোঁজো, কিছু না কিছু অবশ্যই পেয়ে যাবে।

রহস্যের শুরুটা কোনখানে?

লেকের পাড়ে।

তারমানে আবার যাওয়া দরকার ওখানে। একা যাবে? নাহ্, আর একা নয়। তারচেয়ে কয়েকজন মিলে যাওয়া যাক। একজোড়া চোখের চেয়ে কয়েক জোড়া চোখ সূত্র খুঁজে বেড়াতে পারবে অনেক বেশি।

রবিনকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

দরজায় তালা দেয়া। বাড়তি চাবিটা দরজার পাশে দেয়ালের

কোন্ খোপে রাখা থাকে জানা আছে তার। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। সিটিং রুমে না গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল ফোন করার জন্যে। রান্নাঘরটা কাছে। খিদে পেলে খাবারও পাওয়া যাবে। তা ছাড়া চাচা যদি কোন মেসেজ রেখে যান, ওখানেই টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে যাবেন।

নিজের বাড়ি। অথচ কেমন অদ্ভুত লাগছে অন্ধকার ঘরে ঢুকে। অপরিচিত লাগছে, আগে যেটা কোন সময়ই লাগত না তার। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। চাচী কোথায়?–এতক্ষণে প্রশ্নটা মনে জাগল। দুই ঘণ্টার মধ্যে তাকে তুলে নেয়ার কথা ছিল ডাক্তার জগের বাড়ি থেকে। পেটের ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি শেষ হয়নি এখনও? বহু আগেই হয়ে যাওয়ার কথা। এতক্ষণ লাগার কোন প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু আগে থেকে যোগাযোগ করেই গিয়েছিলেন তিনি।

আলো জ্বলার পরেও দেয়াল ঘড়িটার টিক-টিক শব্দ অতিরিক্ত জোরাল মনে হচ্ছে নীরব, নির্জন ঘরে।

টেবিলে কাপ চাপা দিয়ে রাখা মেসেজটা চোখে পড়ল প্রথমেই। চাচা লিখে রেখে গেছেন:

কিশোর, তোর চাচী হাসপাতালে। পেটের ব্যথার কারণটা জানা গেছে। অ্যাপেনডিক্স। অপারেশন লাগবে। জেনারেল হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। ফোন নম্বর জানা না থাকলে ডিরেক্টরি থেকে বের করে নিস। আমি হাসপাতালে গেলাম।–রাশেদ পাশা।

মাথার মধ্যে চক্কর দিতে আরম্ভ করল কিশোরের। অ্যাপেনডিক্সের ব্যথা শুরু হওয়ার আর সময় পেল না। তার এই

মানসিক অবস্থার মধ্যে…লোকে বলে কাকতালীয় ঘটনা ঘটে না। এখন তো দেখা যাচ্ছে ঘটে। প্রচুর ঘটে। অতি বাস্তববাদীরা বিশ্বাস করতে চায় না। কিংবা ঘটতে দেখেও বোকা কাকের মত চোখ বুজে রাখে। নিজেকে এ মুহূর্তে বোকা কাক মনে হতে লাগল কিশোরের।

চাচীর জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। হাসপাতালে যাওয়া দরকার। তবে তারচেয়ে জরুরী, রহস্যটার সমাধান করা। পুরো পরিস্থিতিটা কেন যেন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে তার। আরও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

রিসিভার তুলে আগে রবিনকে ফোন করল।

'হালো?' জবাব দিলেন রবিনের আম্মা মিসেস মিলফোর্ড।

'আন্টি? আমি, কিশোর। রবিন কোথায়?'

'খাচ্ছে। দেব?'

'দিন।'

খাবার মুখে নিয়ে ফোন ধরল রবিন। 'হালো'টা শোনাল 'হারলো!'

'রবিন!' ফিসফিস করে নিজেকে কথা বলতে শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল কিশোর। এ ভাবে চাপাস্বরে কথা বলছে কেন! 'রবিন, ডাক্তারের অফিসে আমার ওপর হামলা হয়েছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।'

উত্তেজনায় তাড়াহুড়ো করে খাবার গিলতে গিয়ে গলায় আটকে গেল রবিনের। 'কি হয়েছিল?'

মাথার মধ্যে চক্কর দিয়ে উঠল কিশোরের। বমি বমি লাগল।

grohon.com

দুই আঙুলে কপাল টিপে ধরল সে। ব্যথা শুরু হয়েছে।

'কিশোর?' গলা চড়ল রবিনের। 'শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, শুনছি,' কপালের ব্যথাটা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল কিশোর। 'কেউ আমার পিছু লেগেছে। মনে হচ্ছে, খুন করতে চায়।'

'কোথায় তুমি এখন, কিশোর?' রবিনের কণ্ঠে ভয়। 'ভাল আছো তো?'

'ভালই আছি, এখন পর্যন্ত। আমাদের বাড়ি থেকে কথা বলছি, রান্নাঘরের ফোন থেকে।'

'ওহ্, বাঁচালে!' চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা শব্দ করে ছাড়ল রবিন। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'কিশোর, শোনো, ফোনে কথা বলে হবে না। মুখোমুখি আলোচনায় বসা দরকার আমাদের। আমি, মুসা, জিনা, তুমি।'

'আমিও সে-কথাই ভাবছিলাম। দেরি করা উচিত হবে না। আজ রাতেই।'

'কোথায়? আমাদের হেডকোয়ার্টারে?'

'না, যেখানে এর উৎপত্তি—লেকের ধারে। আমার মন বলছে, জবাব যদি পাওয়া যায়, ওখানেই পাওয়া যাবে।' একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে কিশোরের। কথাগুলো যেন তার মুখ থেকে নয়, অন্য কারও মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, পাখি পড়ানোর মত করে। নয় মাস গায়েব থেকে ফিরে আসার পর কত রকম কাণ্ডই যে হচ্ছে! 'মুসা আর জিনাকেও নিয়ে যেয়ো। তবে রাফিকে যেন না নেয়। ও ঝামেলা করবে। সূত্র খুঁজতে অসুবিধে হবে আমাদের।'

grohon.com

'ঠিক আছে। খেয়ে উঠেই ফোন করছি ওদের। কখন দেখা হচ্ছে?'

'এই বারোটা নাগাদ। যদ্দূর মনে পড়ে, মধ্যরাতেই অঘটনটা ঘটেছিল আমার।'

গুড-বাই জানিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর।

ঘড়ির দিকে তাকাল। আটটা বাজে প্রায়। হাতে আছে এখনও চার ঘণ্টা সময়। বহু সময়। হাসপাতালে যাবে চাচীকে দেখতে? যেতে তো খুবই ইচ্ছে করছে, কিন্তু আটকা পড়ার ভয়ও আছে। ওকে দেখলে, ডাক্তারের ওখানে কি অঘটন ঘটেছে জানতে পারলে, আর ছাড়তে চাইবে না চাচা বা চাচী কেউই। হাসপাতালে আটকে রাখবে। তাতে রবিনদের সঙ্গে মিটিংটা আর হবে না। রহস্যের জবাব খোঁজা পণ্ড হবে। ওদের সঙ্গে দেখা করাটা অনেক বেশি জরুরী মনে হলো ওর কাছে। মনে হলো, নয় মাস সে কোথায় ছিল এই প্রশ্নের জবাব জানার ওপর নির্ভর করছে তার বাঁচা-মরা।

চাচীর কাছে চাচা রয়েছে। তার না গেলেও কোন সমস্যা হবে না। বরং খানিক বিশ্রাম নিয়ে, কিছু খেয়েদেয়ে লেকের পাড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হওয়াটা এখন জরুরী।

ওপরতলায় নিজের ঘরে উঠে এল সে। ছেঁড়া পোশাক বদলাতে গিয়ে প্যান্টের পকেটে শক্ত জিনিসটার অস্তিত্ব টের পেল।

বের করে এনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

একটা মিনি ভিডিও ক্যাসেট।

দশ

চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। এই ক্যাসেটটাই ক্যামেরায় ভরতে দেখেছিল ডাক্তার জগকে। হাত কাঁপছে ওর থরথর করে। কোনমতেই স্থির রাখতে পারছে না। শেষে স্বাভাবিক করার জন্যে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল। ক্যাসেটের ওপরে লেখা লেবেলটা পড়ল:

সাবজেক্ট: কিশোর পাশা

এগ্‌জামিনার: হ্যাঙ্গামায়া জুগোজুয়ো

তারিখ: ৪/২৩

ডাক্তারের অফিস থেকে খোয়া গেছে টেপটা। সে পকেটে ভরে নিয়ে এসেছে। কেন? কয়েকটা সম্ভাবনা লাফ দিয়ে উঠে এল মগজে। প্রত্যেকটা সম্ভাবনা ঠাণ্ডা করে দিতে চাইল তার 'রূপালী রক্ত'।

ক্যাসেট হাতে ভিসিআরটার দিকে ছুটল সে। চালু করে দিল টেলিভিশন। মাথার মধ্যে কে যেন বলছে: খবরদার, কি আছে ওর মধ্যে দেখো না! কিন্তু অন্য আরেকটা মন বলছে: দেখো, অবশ্যই দেখো! নাহলে জানতে পারবে না তোমার ভেতরে কি ঘটছে!

grohon.com

দ্বিতীয় মনটার জোর আর প্রভাব যেন প্রথমটার চেয়ে বেশি। ভিসিআর-এ ক্যাসেট ঢোকাল সে। প্লে টিপতে চালু হয়ে গেল মেশিন। ঘুরতে আরম্ভ করল ফিতে।

ছবির কোয়ালিটি ভাল না, দুর্বল চিত্র। ঘরে আলো ছিল খুব কম। তবে ভাল জাতের ক্যামেরা দিয়ে তোলা হয়েছে। বোঝা যায়। ডাক্তারের অফিস ঘরটা ফুটে উঠল টিভির পর্দায়। ক্যামেরার পেছনে থাকায় ডাক্তারকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে কল্পনায় স্পষ্ট দেখছে তাঁর চেহারা, মাথার পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে বাঁধা লম্বা, সাদা চুল। নিজেকে কাউচে শুয়ে থাকতে দেখল। ঢিলেঢালা মুখের চামড়া, চোখ বোজা–ঘুমন্ত মানুষের মত। কিন্তু দেহের প্রতিটি পেশি টানটান, ছবিতেও বোঝা যাচ্ছে।

'তোমাকে আমি পেছনে নিয়ে যেতে চাই,' ডাক্তার বলছেন। 'মনটাকে ছড়িয়ে দাও। যতটা সম্ভব ছড়াও। ভাবো। ভাবতে থাকো। চলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। আগস্টের এক উষ্ণ রাত্রি। তুমি একা। লেকের ধারে। কি দেখেছ?'

'মেঘ...শুধুই মেঘমালা! ওগুলো নড়ছিল!' জবাব দিল কিশোর। নিজেকে ওই ভঙ্গিতে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগছে তার। যে সব কথা বলেছে সেগুলো এখন আর মনে করতে পারছে না।

'তারপর কি হলো?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

'তারপর...' মিলিয়ে গেল কিশোরের কণ্ঠ। উদ্ভট কিছু ঘটছে পর্দায়। বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ওর চেহারা।

'বলো?' প্রশ্নটায় জোর দিলেন ডাক্তার।

'তারপর...' আবার মিলিয়ে গেল কিশোরের কণ্ঠ। পুরো চেহারাটাই বদলে যাচ্ছে। চামড়ার নিচে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। সামনে ঝুঁকলেন ডাক্তার। অনেক সামনে এগিয়ে গেছেন। ভাল করে কিশোরকে দেখার জন্যে। ক্যামেরার সামনে চলে এল তাঁর মুখ। দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট উত্তেজনা চেহারায়।

'কিশোর? তুমি ঠিক আছো তো, কিশোর? তোমার কি হচ্ছে? আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

ছটফট করতে লাগল কিশোর। কাঁপতে শুরু করল মৃগী রোগীর মত। যেন ট্যাজার গান দিয়ে গুলি করা হয়েছে ওকে। ট্যাজার গান! আশ্চর্য! কোথায় শুনেছে ওই অস্ত্রের নাম? ছবিতে দেখল ঝটকা দিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে গেল তার দেহটা। কাউচের গদিতে মুখ গুঁজল।

এগিয়ে গিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন ডাক্তার। 'কিশোর? জলদি বলো, কিশোর!' কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিলেন কিশোরকে।

মুখ তুলল কিশোর। ডাক্তারের দিকে তাকাল। সরাসরি।

ভীষণ চমকে লাফ দিয়ে দুই কদম পিছিয়ে গেলেন ডাক্তার। কথা বলার জন্যে মুখ খুললেন। হাঁ হয়েই রইল মুখটা। কথা বেরোল না।

নিজের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন কিশোর। চোখের পাতা খোলা। কিন্তু চোখ নেই সেখানে। কোটর দুটো শূন্যও নয়। চোখের জায়গায় গোল গোল দুটো চাকতি। তাতে কোন মণি নেই। শুধুই দুটো চাকতি। একধরনের আভা বেরোচ্ছে সে-দুটো

থেকে।

হাত-পা ছড়াতে থাকল ছবির কিশোরের। টানটান হয়ে যেতে লাগল চামড়া। মোমের মত ফ্যাকাশে রঙ। পাতলা হয়ে এল মাথার চুল। বয়স্ক মানুষের মত। দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে গেল শরীরটা।

বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে আসল কিশোরের। সাংঘাতিক উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে আছে ছবির দিকে। নিজের এই ভয়াবহ পরিবর্তন দেখছে বিমূঢ় হয়ে।

ছবিতে পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন ডাক্তার। ক্যামেরার ট্রাইপডে পা বেধে উল্টে পড়ে গেলেন।

'আমি দুঃখিত,' হিসহিস করে উঠল পর্দার খুনীটা, 'কিন্তু না বলে পারছি না, তোমার সময় শেষ হয়ে গেছে, ডাক্তার! অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তুমি!'

চিতাবাঘের মত মসৃণ গতিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কাউচে শোয়া দানবটা। কিশোরের সঙ্গে সামান্যতম মিল নেই আর এখন। দাঁত বের করে ফেলেছে জানোয়ারের মত। ধস্তাধস্তি শুরু হলো। তবে ক্যামেরার চোখের বাইরে বলে ভয়ানক সেই দৃশ্যটা আর নিজের চোখে দেখতে হলো না কিশোরকে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল ডাক্তারের। তারপর গড়গড়া করার মত শব্দ বেরোল গলার গভীর থেকে। অবশেষে চুপ।

কাজ শেষ হয়ে গেছে মনে করে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াল আবার ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। মাথার মধ্যে চাপ অনুভব করছে কিশোর।

ক্যামেরার চোখের দিকে ঘুরে তাকাল দানবটা।

কিশোরের মাথার মধ্যে কে যেন বলে উঠল, 'কিশোর পাশা, আমাকে চিনতে পারছ না?'

কে কথা বলে! কে?–চমকে গেল কিশোর। চারপাশে তাকাতে লাগল।

'আমি তোমার ভেতরেই রয়েছি,' হিসহিসে কণ্ঠটা বলল। 'কিশোর পাশা, এখনও যদি বুঝে না থাকো তুমি কে, তাহলে শোনো, তোমার আসল রূপটা হচ্ছি আমি। কিশোর পাশার ছদ্মবেশ নিতে বাধ্য হয়েছি।'

'তুমি কে?' ছবির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

'আমি অন্য জগতের মানুষ!' নিজের মগজ থেকে জবাব পেল কিশোর। 'ছবিতে এখন যাকে দেখছ, সে-ই হলাম আসল আমি, তোমার মধ্যে বসে আছি।'

কুৎসিত, জঘন্য এই দানবটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল কিশোর। 'কিন্তু তাহলে নিজেকে কিশোর পাশা ভাবছি কেন আমি?'

'ভাবছ, তার কারণ আমার মগজে কিশোর পাশার মগজের কোষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে,' নিজের মগজ থেকে জবাব পেল কিশোর। 'কিশোর পাশা বানিয়ে পাঠানো হয়েছে আমাকে পৃথিবীর এ সময়ে বাস করা প্রতিটি ক্ষতিকর এজেন্টকে শেষ করে দেয়ার জন্যে। নইলে আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে ওরা। আমার মিশন, ওদের সবাইকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করা।

grohon.com

grohon.com

'লেকের পাড়ে কিশোরকে পেয়ে গিয়ে সুবিধেই হয়েছিল আমাদের। বুঝতে পেরেছিলাম, এখানে আমাদের মিশন সফল করতে হলে তার রূপ ধরলে অনেক সুবিধে হবে। কারণ এখানে অনেক বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে তার বন্ধু, পুলিশ তার বন্ধু—কিশোর পাশার রূপ ধরলে তাদেরকে বশে আনতে, তাদের দিয়ে কাজ করাতে সুবিধে হবে আমাদের। তাই কিশোর হতে আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে, স্মৃতি-কোষ থেকে কোষ নিয়ে আমার মগজে ইনজেক্ট করে দেয়া হয়েছে যাতে কিশোরের পরিচিতজনদের চিনতে পারি, তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারি; ছদ্মবেশটা একশো ভাগ নিখুঁত হয়।'

এই তাহলে জবাব! কিশোর পাশার মগজের কোষগুলো ভাবল। দানবটাকে শুধু কিশোর পাশার চেহারাই দেয়া হয়নি, তার অতীত স্মৃতিটাও পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হয়েছে। নয় মাস আগের স্মৃতি। যে কারণে পরের নয়টা মাস মনে করতে পারছে না দানবের মগজে ঢোকানো কিশোরের মগজের কোষ। কারণ পরের স্মৃতি-কোষ আর ঢোকানো হয়নি।

কিন্তু আগের কোষগুলো ঢোকাল কিভাবে? জবাব এল নিজের মগজ থেকে: আলাদা ডিস্ক থেকে কম্পিউটারের সফটওয়্যার ডাউনলোডিঙের কায়দায়।

একটা অতি উন্নত টেকনিক। মগজের কোষ পরিবর্তনের, একজনের মাথা থেকে আরেকজনের মাথায় প্রতিস্থাপনের। চোখের সামনে দানবটাকে দেখতে পাচ্ছে। নিজের মগজে জবাব শুনতে পাচ্ছে। অবিশ্বাস করার আর প্রশ্নই ওঠে না। গত

কয়েকদিনে তার উদ্ভট আচরণের জবাবও এখন পেয়ে গেছে কিশোরের মগজের কোষগুলো। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমসের একটা কথা মনে পড়ল: অসম্ভব ব্যাপারগুলোকে যদি বাদ দিয়ে দাও, দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, সেটা যত অবিশ্বাস্য আর পাগলামিই মনে হোক না কেন, সেটাই সত্য। পর্দার দিকে তাকিয়ে সত্যটা মেনে নিতে কষ্ট হলেও না নিয়ে পারল না কিশোরের মগজের কোষ।

ক্ষতিকর এজেন্টদের ধ্বংস করে দিতে পাঠানো হয়েছে। তারমানে সে একজন খুনী। দেহের রূপ পরিবর্তন করতে পারে—অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা! সত্যি বলেছে রিটা।

বিদ্যুৎ চমকের মত আরেকটা কথা খেলে গেল কিশোর-মগজে, খুনীটার 'ক্ষতিকর এজেন্ট'দের মধ্যে রিটাও পড়ে না তো! ডানাকেও হয়তো সে-কারণেই তুলে নিয়ে গেছে।

'রিটা কি ক্ষতিকর এজেন্ট?' জানতে চাইল কিশোর-মগজ।

'হ্যাঁ। তুমি যার কথা ভাবছ, ডানা, সে-ও রয়েছে ক্ষতিকরদের তালিকায়।'

'সে এখন কোথায়?'

'বাইরের কাউকে বলা নিষেধ।'

ভাবছে কিশোর-মগজ। রাফিয়ানের অদ্ভুত আচরণের মানে এখন পরিষ্কার। আর কেউ চিনতে না পারলেও কুকুরটা ঠিকই চিনে ফেলেছিল, কিশোর পাশার মত দেখতে ওই লোকটা আসল কিশোর নয়। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মিশন শেষ হয়েছে?'

'না, সবাইকে খুঁজে পাইনি। একআধজনকে ধ্বংস করে লাভ

grohon.com

নেই, তাতে সতর্ক হয়ে যাবে বাকিরা। আজ রাত বারোটায় আমার এবারকার মিশনের সময় শেষ। মাদার শিপটা আসবে তুলে নিতে। লেকের পাড়ে। ঠিক মাঝরাতে।'

মাঝরাত!

চমকে গেল কিশোর-মগজ। মাঝরাতে লেকের পারে দেখা করতে বলেছে রবিনকে। মুসা আর জিনাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে। সর্বনাশ! ভয়ানক বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওদের।

'রবিনদের কথা ভাবছ তো?' দানব-মগজটা বলল। 'ভালই করেছ ওদের লেকের পাড়ে যেতে বলে। ওদের তুলে নিয়ে যেতে বলব আমি আমার কমরেডদের। তোমার মত আরও কয়েকজনের ছদ্মবেশ ধরতে পারবে আমাদের এজেন্টরা। একটা কাজের কাজই হবে। আসল মিশন ব্যর্থ হলো বলে আমার ওপর আর রাগ করবেন না লীডার...'

ছবি চলে গেল পর্দা থেকে। ফিতে শেষ। কিংবা ক্যামেরাটা থেমে গিয়েছিল, আর ছবি ওঠেনি।

মাথার চাপটা কমে গেল কিশোরের। যে কোন কারণেই হোক, অফ হয়ে গেছে দানব-মগজটা। আয়নায় নিজের দিকে তাকাল সে। কিশোরের চেহারাই দেখা যাচ্ছে এখন। বুঝতে পারছে, দানবের রূপ ধরে ডাক্তারকে পিটিয়ে ক্যাসেটটা হাতিয়ে নিয়ে ডাক্তারের গাড়ি নিয়েই পালাচ্ছিল দানবটা। পুলিশের তাড়া খেয়ে বাঁচার জন্যে আবার কিশোরের ছদ্মবেশ ধরেছে। সেই রূপেই আছে এখন। মগজটাও কাজ করছে কিশোরেরই।

ভাবল, রবিনদের সাবধান করে দিতে হবে যাতে লেকের পাড়ে

না যায়। লাফ দিয়ে গিয়ে ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিল কিশোর। ফোন করল রবিনদের বাড়িতে।

এবারও ফোন ধরলেন রবিনের আম্মা। 'হালো?'

'আন্টি, আমি কিশোর। রবিনকে...' থেমে গেল কিশোর। খুট করে একটা শব্দ হয়েছে লাইনে। মুহূর্তে বুঝে গেছে কি ঘটেছে। ফোনটা এখন ডেড।

ডায়াল টোন নেই। একেবারে স্তব্ধ। তার কেটে দেয়া হয়েছে।

দপ করে নিভে গেল ঘরের বাতি। মেইন সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে।

বাড়িতে ঢুকেছে কেউ!

পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়তে গাড়িটা দেখতে পেল। বহু পুরানো ৬৮ মডেলের ঝরঝরে একটা পন্টিয়াক দাঁড়ানো। গাড়িটা এর আগে কখনও দেখেনি সে।

কিশোরদের পাশের বাড়িটা, অর্থাৎ পড়শীর বাড়িটা ইয়ার্ড থেকে বেশ খানিকটা দূরে। জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। জেগেই আছে। একটা প্ল্যান দ্রুত তৈরি হয়ে যেতে লাগল কিশোর-মগজে। কেউ যে হামলা করতে আসছে তার ওপর, বুঝে গেছে। হামলাকারী কাছে আসার আগেই চুপ করে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে সে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে চলে যাবে পড়শীর বাড়িতে। পুলিশকে ফোন করতে পারবে ওখান থেকে।

ডাইনিং রুম পার হয়ে পেছনের দরজার কাছে চলে এল সে। পালানো খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হলো না।

grohon.com

কিন্তু হামলাকারী তারচেয়ে কম চালাক নয়।

দরজার বাইরে বেরিয়ে আঙিনায় নামার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের অন্ধকার থেকে বলে উঠল একটা খসখসে কণ্ঠ, 'চমকে দিলাম, তাই না?'

কিশোর কিছু করার আগেই একটা কাপড়ের থলে টেনে দেয়া হলো ওর মাথার ওপর দিয়ে। টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। লোকটা অসম্ভব শক্তিশালী। তার দুই হাত পেছনে মুচড়ে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলল। মাথার পেছনে শক্ত বাড়ি লাগল কঠিন কোন জিনিসের। দ্বিতীয়বারের মত বেহুঁশ হলো সেদিন কিশোর।

এগারো

এবং দ্বিতীয়বারের মত সেদিন অন্ধকারে জ্ঞান ফিরল তার। নাকে ঢুকল গাড়ির তেলের গন্ধ। প্রচুর ঝাঁকি লাগছে। দুই-দুইয়ে যোগ করে অনুমান করে নিল গাড়ির ট্রাংকে ভরে রাখা হয়েছে ওকে। নিশ্চয় রাস্তায় দাঁড়ানো সেই পন্টিয়াকটাতে।

একটা ব্যাপার খচখচ করছে মনে। এবার তার পিছনে কে লেগেছে? ভিনগ্রহবাসী অন্য কেউ? সম্ভাবনাটা কম। ওরা জানে সে ওদের অনুচর, ওদের কথা মত কাজ করছে। তবে এমন হতে পারে কোন কারণে সন্দেহ হয়েছে ওদের, অন্য কোন এজেন্টকে পাঠিয়েছে যাচাই করে দেখার জন্যে।

আরও কিছুদূর চলে থামল গাড়ি। ট্রাংকের তালা খোলার শব্দ হলো। ডালা উঠল। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। মাথায় থলে পরানো। শক্ত হাত টেনে-হিঁচড়ে বের করল তাকে। কথা বলার চেষ্টা করল। তা-ও পারল না। টেপ আটকে রাখা হয়েছে মুখে। ও যখন বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল, তখনই নিশ্চয় আটকানো হয়েছিল।

ঠেলেঠুলে তাকে গাড়ির সীটে বসিয়ে দেয়া হলো। ট্রাংকের

তালা লাগানোর শব্দ শুনতে পেল। তারপর দড়াম করে বন্ধ হলো ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা। আবার চলতে শুরু করল গাড়ি।

মাথা থেকে হ্যাঁচকা টানে থলে খুলে নেয়া হলো। পেশিবহুল একজন মানুষকে দেখতে পেল সে। দেখামাত্র চিনল।

'চিনতে পারছ আমাকে, কিশোর?' স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরেছে লোকটা, রাস্তার দিকে চোখ।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

লোকটা মার্টিন ড্রোজার, সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কিশোরকে খুঁজে বের করার জন্যে নিয়োগ করেছিলেন তার চাচা। কিন্তু ও এখন তাকে কিডন্যাপ করছে কেন? সে-ও কি ভিনগ্রহবাসী, কিংবা ভিনগ্রহবাসী কোন খুনী ভর করেছে তার ওপর?

শহরের বাইরে চলে এসেছে গাড়ি। নির্জন হাইওয়ে ধরে দূরে সরে যাচ্ছে। এক সময় রকি বীচের আশেপাশে যখন মাইনিং কলোনিগুলো গড়ে উঠেছিল, তখন মূল শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিল অনেকগুলো রাস্তা–তারই একটা এখন হাইওয়ে হয়েছে, আর সেটা ধরেই ছুটে চলেছে গাড়ি। পোড়ো কোন খনি-শহরে তাকে নিয়ে যাচ্ছে নাকি লোকটা? কেন? আটকে রাখার জন্যে? নাকি খুন করার জন্যে?

'চিনতে পারায় খুশি হলাম, খোকা,' তরল কণ্ঠে বলল ড্রোজার। 'তারমানে স্মৃতিশক্তি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি তোমার। আমার চেহারার ছাপ ঠিকই পড়েছে ওখানে। যাকগে, তুমি নিশ্চয় জানো, আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

ভুসভুস করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে লোকটার মুখ থেকে। সহ্য করতে পারছে না কিশোর।

'নয়টি মাস ধরে তোমার কেসটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি,' লোকটা বলল। 'তোমার সম্পর্কে সব জানা আছে আমার। তুমিও একজন শখের গোয়েন্দা। আমার চেয়ে অনেক বেশি খুঁতখুঁতে। কোন রহস্যের কিনারা করতে না পারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। নিশ্চয় ভেবে মরছ এখন, ঘটছেটা কি?'

ভুল বলেনি ড্রোজার। সে কি করতে চাইছে, সত্যি জানতে চায় কিশোর। তবে 'তোমার সম্পর্কে আমি সব জানি' এ কথাটা ঠিক বলেনি লোকটা। সে নিশ্চয় জানে না, ডাক্তার জগের অফিসে সত্যি সত্যি কি ঘটেছে। কিশোররূপী ছেলেটার মগজে কোন দানব বাসা বেঁধে আছে, সেটাও হয়তো কল্পনা করতে পারছে না সে।

'সবাই আমাকে জানিয়েছে,' ড্রোজার বলল, 'গোয়েন্দা হওয়ার জন্যে তুমি পাগল। তুমিও গোয়েন্দা, আমিও গোয়েন্দা–গোয়েন্দা মানসিকতার মানুষগুলোর কৌতূহল আমার জানা। সুতরাং অকারণে তোমাকে অন্ধকারে রাখার কোন যুক্তি দেখতে পাচ্ছি না আমি। কেন কিডন্যাপ করেছি সেটা নিয়ে কৌতূহল হচ্ছে তো? শোনো, এর কারণ, টাকা। তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে নয় মাসে অনেক টাকা দিয়েছেন আমাকে তোমার চাচা। ভাল অবস্থায় ছিলাম আমি, খরচের হাত বেড়ে গিয়েছিল–মাসে মাসে এত টাকা জীবনেও আর কামাইনি কখনও, বেশ আরামেই ছিলাম।' স্টিয়ারিঙে আচমকা মোচড় দিয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি নামিয়ে নিল

grohon.com

grohon.com

ড্রোজার। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। হেডলাইট নিভাল। এতক্ষণে আর কোন গাড়ি চোখে পড়েনি কিশোরের। এখনও পড়ছে না। যেন নো-ম্যানস-ল্যান্ডে পৌছে গেছে ওরা।

'তারপর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করেই এসে উদয় হলে তুমি। দিলে আমার ইনকামের বারোটা বাজিয়ে। স্বভাবতই টাকা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে তোমার চাচা। কিশোর, ভেবে দেখো ব্যাপারটা, মাসে মাসে এতগুলো টাকা বন্ধ হয়ে গেলে তোমার কি অবস্থা হতো? তোমার ওভাবে উদয় হওয়াটা কি ঠিক হয়েছে?' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল ড্রোজার, 'ভাল একটা চাকরি ছিল আমার, দু'হাতে খরচ করেছি, রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি, ঘুম থেকে উঠেই খবর পেলাম চাকরি নট-তোমার হলে কেমন লাগত?

'প্রাইভেট ডিটেকটিভের যে ভাত নেই আজকের দুনিয়ায়-কোনকালে ছিল কিনা তাতেও সন্দেহ আছে আমার-সেটা বোধহয় তোমার জানা নেই। জানলে আর গোয়েন্দা হতে চাইতে না। অবশ্য তোমার কথা আলাদা। বড়লোক চাচার একমাত্র উত্তরাধিকারী, এ সব বিলাসিতা তোমাদের মানায়। কিন্তু আমার বেলায়?' ঢেকুর তুলল ড্রোজার। ভুসভুস করে মদের দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল পেট থেকে। নাকমুখ বিকৃত করে ফেলল কিশোর। সেটা লক্ষ করল না ড্রোজার। বলল, 'তোমার কেসটা এখনও অমীমাংসিত। পুলিশ এখনও রহস্যটার কোন কিনারা করতে পারেনি। তোমার ফিরে আসার পর চাপাচাপি শুরু করেছে ওরা আমাকে। আমি যা যা জানি জানাতে বলছে, নইলে লাইসেন্স ক্যান্সেল করিয়ে দেবার

হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু কি বলব ওদের? বিশ্বাস করো, ন'টি মাসে একটি সূত্রও আমি বের করতে পারিনি। কোন সূত্র নয়। এগোনোর কোন পথ নেই। একজন সন্দেহভাজনকে খুঁজে পাইনি। কিছু না। কিচ্ছু না। তোমাকে বলতে বাধা নেই, কিশোর, এত বিস্ময়কর জটিল কেস, এ রকম রহস্যের মুখোমুখি এত বছরের গোয়েন্দা জীবনে কখনও হইনি আমি।

'যাই হোক, চাকরিটা যাওয়ার পর ভাবনায় পড়ে গেলাম,' বলতে থাকল ড্রোজার। 'ভাবলাম, আবার যদি তুমি গায়েব হয়ে যাও তাহলে কি হয়? যদি আবার কিডন্যাপ করা হয় তোমাকে? আবার তোমার চাচা নিয়োগ করবেন আমাকে। টাকা দেবেন। হয়তো বেশিদিন আটকে রাখতে পারব না তোমাকে। তবে জিম্মি রেখে তোমার চাচার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায়ের সুযোগ এবং সময় দুটোই পাব। টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে গায়েব হয়ে যাব রকি বীচ থেকে। চলে যাব অন্য কোন রাজ্যে। পুলিশ আমার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না।'

ড্রোজারের উদ্দেশ্য এতক্ষণে পরিষ্কার হলো কিশোরের কাছে। ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকাল। এগারোটা তিরিশ বাজে। আধঘণ্টার মধ্যে রবিনরা পৌছে যাবে লেকের পাড়ে। সময়মত ওদের সাবধান করে দিতে না পারলে শয়তান ভিনগ্রহবাসীদের খপ্পরে পড়বে ওরা। হয়তো চিরকালের জন্যে নিখোঁজ হয়ে যাবে। কেউ আর কোনদিন খুঁজে বের করতে পারবে না ওদের। কিংবা ফিরে আসবে কিশোরের মত দানব-খুনীদের রূপ ধরে। তছনছ করবে শান্তিময় পৃথিবীটাকে।

grohon.com

কিন্তু ওদের কাছে যেতে হলে নিজেকে মুক্ত করতে হবে আগে।

'আমার কথায় মনে হয় কান দিচ্ছ না তুমি?' ড্রোজার বলল। 'আমার কথার মানে বুঝতে পেরেছ? তোমাকে কিডন্যাপ করেছি আমি।'

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। মুক্তি পাবার একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছে–ডক্টর জগের অফিসের মত কোনভাবে যদি নিজের রূপটা বদলে ফেলতে পারে। ড্রোজারকে তখন কাবু করা সম্ভব। কিন্তু জানতে হবে কি করে নিজেকে রূপান্তরিত করতে হয়। ডাক্তারের অফিসে করেছিল সম্মোহিত অবস্থায়। সচেতন থেকে কি করে করতে হয় জানা নেই। আরেকটা চিন্তা ঢুকল মাথায়। দানবে পরিণত হওয়ার পর রবিনদের প্রতি সহানুভূতিটা থাকবে তো? নাকি শত্রু ভেবে ক্ষতি করার ইচ্ছেটাই প্রবল হবে?

এত কথা ভাবার সময় নেই এখন। ঝুঁকি নিতেই হবে।

'অ্যাই, কথা বলছ না কেন! তোমাদের মত ছেলেদের নিয়ে এটাই সমস্যা,' বিরক্ত হয়ে উঠেছে ড্রোজার। 'তোমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার কোন কিছুই তোমাদের ছুঁতে পারে না, কোন বাধাই বাধা নয় তোমাদের কাছে।'

ড্রোজারের কথা কানে ঢুকছে না কিশোরের। বুঝতে চাইছে, ডাক্তারের অফিসে পরিবর্তনটা তার কখন, কিভাবে ঘটেছিল। সম্মোহিত অবস্থায় তার সচেতন মগজ কাজ করছিল না। নিজেকে আবার সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? নিজে নিজে সম্মোহিত হওয়া? কিংবা অবচেতন মনের প্রবল ইচ্ছে শক্তিকে জাগিয়ে

তোলা?

চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই। চোখ বন্ধ করে অবচেতন মনটাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালাল সে। মনের সমস্ত ইচ্ছেশক্তি এক করে ভাবতে শুরু করল, সে ঘুমের জগতে চলে যাচ্ছে। কল্পনা করতে লাগল, সে আর কিশোর পাশা নয়, অন্য কেউ। সেই 'কেউ'টাকে কিশোর পাশার জায়গায় ঠাঁই নেয়ার জন্যে জোরাল আবেদন জানাতে শুরু করল। হঠাৎ মনে হলো কাজ হচ্ছে! নিজের মধ্যে ধীর পরিবর্তনটা টের পেতে আরম্ভ করল।

'কি ব্যাপার, কিশোর, অমন করছ কেন তুমি?' শঙ্কিত হয়ে উঠল ড্রোজার। 'কাঁপছ কেন অমন করে? জ্বর আসছে?'

মাথার মধ্যে গরম লাগছে কিশোরের। সত্যি যেন জ্বর আসছে। একশো সাত-আট ডিগ্রি। উত্তাপটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল সমস্ত দেহে। প্রচণ্ড শক্তি তৈরি হচ্ছে শরীরে।

'কথা বলছ না কেন, খোকা? অ্যাই, কিশোর?' মনে পড়ল ড্রোজারের, মুখে টেপ আটকে রাখলে কেউ কথা বলতে পারে না। একটানে খুলে দিল টেপটা।

সরাসরি তার কিডন্যাপারের দিকে তাকাল কিশোর, কিংবা তার পরিবর্তিত রূপ। নিতান্তই ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে এখন লোকটাকে। বিড়াল যে ভঙ্গিতে ইঁদুরের দিকে তাকায়, তেমনি করে তাকাল যেন কিশোরের রূপান্তরিত দেহ। তারমানে কাজ হয়েছে। দানবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সে।

ড্রোজারের চোখে আতঙ্ক দেখতে পেল কিশোর। কল্পনায়

grohon.com

দেখতে পাচ্ছে টিভির পর্দা থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকা দানবটার চোখের জায়গায় দুটো ডিস্কের মত চ্যাপ্টা গোল গোল জিনিস।

'খোকা!' ড্রোজারের সম্বোধনটাই তাকে ফিরিয়ে দিল কিশোর। 'ভুল দিনে ভুল লোককে কিডন্যাপ করতে এসেছ তুমি।'

মরুভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আগুন-গরম দমকা বাতাসের মত এসে প্রচণ্ড শক্তি যেন ছড়িয়ে পড়ল কিশোরের দেহের অণু-পরমাণুতে। 'ইনক্রেডিবল হাল্কের' মত বিশাল হয়ে যাচ্ছে দেহটা। পটপট করে ছিঁড়তে শুরু করেছে কাপড়ের সেলাই। কিন্তু এত দ্রুত বেড়ে গেল শরীর, সুতো ছিঁড়েও শেষ রক্ষা করতে পারল না কাপড়, ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যেতে লাগল। প্রচণ্ড চাপে ঠাস করে ছিঁড়ে গেল চামড়ার সীটবেল্ট। ইস্পাতের তারের মত পেশি গজিয়ে উঠেছে দুই বাহুতে।

আতঙ্কে হাঁ হয়ে গেছে ড্রোজারের মুখ।

'তুমি আমাকে কিডন্যাপ করেছিলে না,' নিজের কানেই নিজের কণ্ঠস্বর বেখাপ্পা শোনাল কিশোরের। ওর কণ্ঠ নয়। বড়ই যান্ত্রিক, অন্য কারও গলা। 'এখন আমি তোমাকে কিডন্যাপ করলাম মিস্টার মার্টিন ড্রোজার।'

চিৎকার করে ওঠার আগেই পিস্টনের মত সবেগে কিশোরের কনুইটা ছুটে গেল একপাশে, ড্রোজারের চোয়ালে আঘাত হেনে স্তব্ধ করে দিল তাকে। কাত হয়ে ঢলে পড়ল ড্রোজারের মাথা। এক আঘাতেই বেহুঁশ। দুই মিনিটের মধ্যেই ট্রাংকে চলে গেল সে, কিশোর যেখানে ছিল।

কি ভাবে উল্টে গেল দাবার ছক! প্রচণ্ড এই ক্ষমতা এখন উপভোগ করছে কিশোর। মজা পেতে আরম্ভ করেছে।

সীটের ওপর পড়ে আছে ড্রোজারের খাকি ওভারকোটটা। কাঁধের ওপর ওটা টেনে দিয়ে নিজের ছেঁড়া পোশাক ঢাকল কিশোর। গাড়িতে উঠল। ড্রাইভিং সীটে।

ঘড়িতে দেখল: পঁচিশ মিনিট বাকি।

বারো

হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের মগজের সঙ্গে কথা বলতে লাগল সে। কিশোর পাশার ভাল চিন্তাগুলোকে এখনও গ্রাস করে ফেলতে পারেনি ভিনগ্রহবাসী দানবের মন্দ চিন্তা। দানবে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতাটা বজায় থাকলেও মগজের কোষগুলো বোধহয় গড়বড় হয়ে যাচ্ছে, কিশোর পাশার মগজটাকে দখল করতে পারছে না আর ডাউনলোড করা দানবের মগজের সফটওয়্যার। চকিতেই কথাটা মাথায় এল কিশোরের, কোনও ধরনের 'কম্পিউটার ভাইরাস' না তো! মানুষের মগজ এক ধরনের কম্পিউটার–কিংবা বলা যায় মানুষের মগজের আদলেই তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটারের ব্রেন। সেটাকে যদি ভাইরাস দুষণে দুষ্ট করা যেতে পারে, মানুষের মগজকে যাবে না কেন? তারমানে অতি উন্নত কোন গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে তার মগজটায় দুষ্ট ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেই ভাইরাসের প্রভাব এখন কাটতে শুরু করেছে। মন্দ ভাবনা আর পেরে উঠছে না ভাল ভাবনার সঙ্গে। রক্ত বদল করেও ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল কোন ধরনের প্রচণ্ড ক্ষমতা। যার সাহায্যে সে নিজের রূপ বদল করে

grohon.com

ফেলতে পারে।

ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড–ঝট করে মনে পড়ে গেল তার। গল্পটাকে আর গল্প মনে হচ্ছে না এখন। তার নিজের বেলাতেই ঘটে গেছে। তারমানে, বাস্তব!

ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে শহরে প্রবেশ করল সে। বন্ধুদের বাঁচানোর চিন্তাটা এখনও প্রবল মনের মধ্যে। পুলিশের টহল-গাড়ির সামনে পড়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। ওর এই ইনক্রেডিবল হাল্ক রূপ দেখলে সন্দেহ করে বসবে পুলিশ। কি করা যায়? কল্পনায় ড্রোজারের চেহারা দেখতে শুরু করল সে। কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না রূপান্তর ঘটাতে। রিয়ারভিউ মিররে নিজের চেহারা দেখে নিজেই তাজ্জব হয়ে গেল। মার্টিন ড্রোজার হয়ে গেছে সে। পুলিশ তো দূরের কথা, ড্রোজারের মা দেখলেও এখন নিজের ছেলে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারবে না।

রাস্তার বাঁকে এসেও গতি কমাল না কিশোর। সময়মত লেকের পাড়ে পৌঁছানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভুলটা করল গতি না কমিয়ে। টহল পুলিশের চোখে ঠিকই পড়ে গেল। লাল-নীল বাতির ঝিলিক তুলে, পোঁ-পাঁ পোঁ-পাঁ করে সাইরেন বাজিয়ে ছুটে আসতে লাগল টহল পুলিশের একটা গাড়ি।

না থামালে বিপদ। ফোনে সতর্ক করে দেবে আশেপাশের সমস্ত গাড়িকে। চতুর্দিক থেকে এসে ঘিরে ফেলবে তখন ওকে ওরা।

ইঙ্গিত পেয়ে গাড়ি থামাল কিশোর। পাশ কেটে গিয়ে তার গাড়ির পথ আটকে দিয়ে গাড়ি থামাল টহল পুলিশ। গাড়ি থেকে

grohon.com

নেমে এল একজন তরুণ অফিসার। নতুন ভর্তি হয়েছে মনে হয়। রকি বীচে দেখেনি আগে কখনও। ইয়ান ফ্লেচারের অফিসেও না। নয় মাস অনেক দীর্ঘ সময়–ভাবছে কিশোর। মাত্র ক'মাসে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে শহরটায়!

টহল পুলিশের সঙ্গে তর্ক করলেই জটিলতা বাড়ে, জানা আছে তার। যা বলে, মেনে নেয়াটা সবচেয়ে উত্তম। জরিমানা করে টিকেট ধরিয়ে দিত যদি এখন, বাঁচা যেত। কম সময় নষ্ট হতো তাতে।

কি করবে বোঝার উপায় নেই। যতটা সম্ভব শান্ত হয়ে বসে রইল কিশোর। কিন্তু মগজের মধ্যে খোঁচানো শুরু করেছে দানব-মগজ: মানুষটাকে পাত্তা দিও না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে দাও খতম করে! দানব-মগজকে জোর করে সরিয়ে দিল কিশোরের মগজ। বোঝাল, খবরদার, ওসব করতে যেও না! গুলি খেয়ে মরবে!

জানালায় উঁকি দিল অফিসার। টর্চের আলো পড়ল কিশোরের মুখে। অপরাধীর লজ্জিত, মোলায়েম হাসি হাসল কিশোর। 'গুড ইভনিং, অফিসার,' কানে বাজল ড্রোজারের কর্কশ কণ্ঠ, এটাও বড় বেখাপ্পা লাগল কিশোরের। তখন মনে পড়ল, ড্রোজার সেজে বসে আছে সে। 'গতি কি বেশি বাড়িয়ে ফেলেছিলাম?'

'অনেক বেশি।'

'তাই?'

'কেন, খেয়াল করেননি?'

'না, ভাই। তাহলে কি আর করতাম?'

'চালাকি করছেন নাকি?'

'না না, কি যে বলেন! তা করব কেন? ভুলটা তো আমারই।'

'তারমানে তাড়া আছে আপনার। এত রাতে এত তাড়া কিসের?'

মিথ্যে বললে সন্দেহ আরও বাড়বে লোকটার। সত্যি কথাই বলল কিশোর, 'আমার বন্ধুদের কথা দিয়েছি, অফিসার। ওরা এসে বসে থাকবে। দেরি করলে লজ্জায় পড়ে যাব।'

সন্তুষ্ট হলো অফিসার। সত্যি কথা বুঝতে না পারার মত বোকা সে নয়। 'বুঝলাম। কিন্তু আপনি আইন তো অমান্য করেছেন।'

'তা করেছি।'

'লাইসেন্স আর অন্যান্য কাগজপত্র,' হাত বাড়াল অফিসার। 'প্লীজ!'

আতঙ্কের অসংখ্য তীক্ষ্ণ সুচ ফুটিয়ে দিল যেন কেউ কিশোরের শরীরে। লাইসেন্স! লাইসেন্স পাবে কোথায়? যদি বলে নেই, তাকে সহ গাড়িটা নিয়ে যাবে এখন থানায়। এত সময় এখন নেই তার হাতে।

আবার মনে পড়ল, সে এখন কিশোর পাশা নয়–মার্টিন ড্রোজার। ড্রোজার নিশ্চয় লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালায় না। এবং এটা ড্রোজারের গাড়ি। কথাটা মনে পড়তেই ওভারকোটের পকেটে হাত ঢোকাল সে। কিছুই ঠেকল না হাতে। অন্য হাত ঢোকাল অন্য পকেটে। শক্ত কিছু লাগল এবার। বের করে আনল।

ড্রোজারের ওয়ালেট। দুটো কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল

grohon.com

অফিসারের দিকে।

ভাল করে দেখে অফিসার বলল, 'মিস্টার ড্রোজার, একটা টিকেট ধরিয়ে দেয়াটাই এখন উচিত ছিল আমার। কিন্তু অকপটে দোষ স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া টিকেট দিতে গেলে অন্তত পনেরোটা মিনিট নষ্ট হবে। বন্ধুদের কাছে লজ্জায় ফেলতে চাই না আপনাকে। এবারের মত ছেড়ে দিলাম। তবে দয়া করে আবার গতি বাড়াবেন না।'

'থ্যাংক ইউ, অফিসার। সত্যি, আমি কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম আপনার কাছে।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল অফিসারের মুখে। 'ঠিক আছে। যান।'

এই সময় শব্দটা শুনতে পেল কিশোর। থাপ-থাপ-থাপ! নির্জন হাইওয়ের নীরবতার মাঝে বড় বেশি জোরাল।

ট্রাংক থেকে শব্দ আসছে। তারমানে হুঁশ ফিরে পেয়েছে ড্রোজার। গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অফিসার কি শুনতে পাবে শব্দটা?

'কিসের শব্দ?' মুহূর্তে অফিসারের টর্চের আলো ঘুরে গেল ট্রাংকের দিকে।

ধড়াস ধড়াস করছে কিশোরের বুক। এর কি জবাব দেবে সে?

আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার 'কিশোর-মগজে'। দানব-মগজ বলছে: খুন করো লোকটাকে, ল্যাঠা চুকে যাক! কিন্তু কুবুদ্ধি দিয়ে কিশোরের মগজকে পরাস্ত করতে পারল না সে। হাত দুটো চেপে বসল স্টিয়ারিঙে। দুটো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে এখন কিশোরের মগজকে: সামনে পুলিশ, মগজের মধ্যে দুষ্ট-দানবের ভাইরাস কিংবা মগজের কোষ, যা-ই হোক।

'কি-কি-কিছু না, অফিসার!' কোনমতে বলল সে।

'তাই?' ট্রাংকের দিকে তাকিয়ে আছে অফিসার। কিশোরের দিকে ফিরল।

মলিন হাসি ফুটল কিশোরের মুখে।

'এত নার্ভাস লাগছে কেন আপনাকে, মিস্টার ড্রোজার?' অফিসারের প্রশ্ন। 'দয়া করে যদি বাইরে আসেন একবার...'

'বেশ, আসছি।'

'আস্তে আস্তে নামবেন,' দুই পা পিছিয়ে গেল অফিসার। 'দুই হাত সামনে বাড়িয়ে। পিস্তল বের করবেন না আবার।'

তারমানে পুরোপুরিই সন্দেহ করে বসেছে তাকে অফিসার।

ট্রাংকের ভেতর থেকে গোঙানি ভেসে এল।

আস্তে করে গাড়ি থেকে নেমে এল কিশোর। ট্রাংকের দিকে মাথা ঝাঁকাল অফিসার। 'কাউকে ভরে রেখেছেন নাকি ওখানে?'

'না, অফিসার,' সরাসরি মিথ্যে বলল এখন কিশোর। মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করেছে মগজের দানবটা।

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন কোন মানুষ নেই ট্রাংকের মধ্যে? আপনাআপনি এ সব উদ্ভট শব্দ বেরোচ্ছে? বেশ, দেখা যাক কি আছে।' হাত বাড়াল অফিসার, 'চাবি!'

ট্রাংকের মধ্যে রীতিমত ঝড় তুলল এখন ড্রোজার। কিল মারছে, লাথি মারছে। এত তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে পাবে ভাবেনি কিশোর। তাহলে অন্য ব্যবস্থা করত।

'দেখুন, অফিসার,' কণ্ঠস্বর বদলে গেল কিশোরের, ড্রোজারের

grohon.com

কণ্ঠও নয়, বেরিয়ে আসছে রোবটের মত যান্ত্রিক কণ্ঠ, 'আপনার নিজের ভালর জন্যেই বলছি...'

'চাবি!' গর্জে উঠল অফিসার। 'জলদি করুন!'

ইগনিশন থেকে চাবির রিঙটা খুলে দিল কিশোর। দানব-মগজটা জয়ী হয়ে যাচ্ছে, সরিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে কিশোরের শুভবুদ্ধিকে।

ট্রাংকের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে অফিসার। চাবি দিয়ে তালা খুলল। ডালার হাতল ধরে টান দিতেই লাফ দিয়ে উঠে গেল স্প্রিং লাগানো ডালা।

ট্রাংকের লোকটার মুখের ওপর আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল অফিসার। বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। এক চেহারার দুজন লোক! সত্যি দেখছে কিনা বোঝার জন্যে ঘুরতে গেল কিশোরের দিকে।

কিন্তু দেখা আর হলো না। কিশোরের ডান হাতের একটা পাশ কারাতের কোপের ভঙ্গিতে তীব্র গতিতে নেমে এল অফিসারের ঘাড়ে। রেঞ্চের হাতল দিয়ে বাড়ি মারার মত শক্ত আঘাত। ড্রোজারের গায়েও কম জোর ছিল না, মনে আছে কিশোরের। এখন ড্রোজার সেজেই আঘাত করেছে সে। টুঁ শব্দ না করে জ্ঞান হারাল অফিসার।

দ্বিতীয় আঘাতটা করল আসল ড্রোজারকে। এবার অনেক জোরে মারল। নিশ্চিত হয়ে নিল, যাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আর হুঁশ না ফেরে ড্রোজারের। ট্রাংকের ডালা নামিয়ে তালা লাগিয়ে দিল আবার।

*

তীব্র গতিতে হাইওয়ে ধরে আবার গাড়ি ছোটাল কিশোর। গতি আগের চেয়ে বেশি। ঘণ্টায় একশো মাইল। টহল পুলিশের পরোয়া করল না। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

তবে এবার আর টহল পুলিশে ধরবে না তাকে, জানে। কারণ পুলিশের গাড়িটাতে করেই চলেছে। অফিসারকে বেহুঁশ করে, তাকে পুলিশের গাড়ির ট্রাংকে আটকে রেখে, তার রূপ ধরেছে। তার পোশাকগুলো পরেছে। ছদ্মবেশ নিতে ছোটবেলা থেকেই মজা পায় কিশোর। এত নিখুঁত ছদ্মবেশ নেয়ার সাংঘাতিক ক্ষমতাটা উপভোগ করছে রীতিমত।

সাইরেন অফ করে দিয়েছে কিশোর। এত সাইরেন শুনলে রাস্তার অন্যান্য টহল পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। এসে ঝামেলা বাধাতে পারে।

দানব-মগজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কিশোর-মগজ। কোনমতে দানবটা একবার জয়ী হয়ে গেলে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। পুলিশের গাড়িতে পুলিশের ছদ্মবেশে এমনিতেই একটা বড় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে আছে সে। তার ওপর দানবটা তার মগজকে গ্রাস করে কুবুদ্ধি দিতে থাকলে রবিনরা একজনও বাঁচতে পারবে না, হয় সে নিজের হাতে খুন করবে ওদের, নয়তো ধরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ভিনগ্রহবাসীদের।

দানবটা যাতে প্রশ্রয় না পায় সেজন্যে ভাল ভাল কথা ভাবতে লাগল কিশোর। তার নিজের জীবনের কথা। অতীতের কথা।

অন্যমনস্ক হওয়ার আরও সুযোগ ঘটল। গাড়ির রেডিওটা বেজে উঠল হঠাৎ: 'ডিসপ্যাচ বলছি! শুনতে পাচ্ছ? ওভার!'

নিজের অজান্তেই অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেডিওর মাইক্রোফোনটা তুলে নিল পুলিশ অফিসার রূপী কিশোরের হাত, 'পাচ্ছি, ডিসপ্যাচ! কি চাও? ওভার!'

'সে ইয়োর ফরটি!'

পুলিশী কথাবার্তাগুলো মোটামুটি জানা আছে কিশোরের। 'সে ইয়োর ফরটি' মানে হলো 'তুমি কে এবং কোথায় আছো জানাও!' ড্যাশের নিচে চোখ চলে গেল তার। গাড়ির আইডেন্টিফিকেশন পড়ে নিল। জবাব দিল, 'কার ইলেভেন। আমি এখন শহরের বাইরে পুরানো সার্ভিস রোডটাতে আছি।'

'কিছু ঘটেছে নাকি, কার ইলেভেন? তোমাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বিপদে পড়েছ?'

'নিগেটিভ,' অর্থাৎ, না-জবাব দিল কিশোর।। 'টিনেজারদের একটা গাড়ির পিছু নিয়েছি। অতিরিক্ত গতিতে ছুটে যাচ্ছে।'

'লেকের দিকে যাচ্ছে না তো?' হাসি শোনা গেল ডিসপ্যাচারের। 'এই ইউ এফ ও সারা শহরটাকে পাগল করে তুলল!'

'মনে হচ্ছে।'

'সাহায্য লাগবে?'

'না, লাগবে না। গোটা দুই ছেলেকে সামলানো কোন ব্যাপারই না। বরং কাছাকাছি কোন গাড়ি আমার পিছু নিয়ে থাকলে সরে যেতে বলো। বেশি পুলিশ দেখলে আর ছেলেগুলো

grohon.com

সন্দেহ করে বসলে সতর্ক হয়ে যাবে; ওরা কি করতে যাচ্ছে, আর বুঝতে পারব না।'

'ঠিক আছে। গুড লাক, কার ইলেভেন। ওভার অ্যান্ড আউট!'

মুচকি হাসল কিশোর। রিয়ারভিউ মিররে চোখ পড়তে মুছে গেল হাসিটা। অফিসারের কঠিন চেহারাটা ফুটে রয়েছে সেখানে। পুলিশরূপী চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে কিশোর। ভয়ঙ্কর এক রাত। সাংঘাতিক তার ক্ষমতা! ক্ষণে ক্ষণে নিজের রূপ পরিবর্তন।

মগজে কুবুদ্ধি দেয়ার চেষ্টা চালাতে লাগল দানব-মগজটা। কিশোরের মগজকে হারিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্যে মরিয়া।

কোনমতেই ওটাকে পাত্তা দিল না সে। ওটার কথা ভাবতে চাইল না। ভাবলেই যদি জোর পেয়ে যায়! আবার নিজের অতীতের কথা ভাবতে লাগল। বন্ধুদের কথা ভাবল। ওদের সঙ্গে কত ভাল ভাল জায়গায় অ্যাডভেঞ্চার করেছে, সে-সব ভাবল। মুসার অতিরিক্ত খাওয়ার কথা ভেবে হাসল।

রাস্তার পাশে নজর পড়তেই যেন বাস্তবে ফিরে এল। আবার নির্জনতা। শহরের শেষ পেট্রল স্টেশনটাও পার হয়ে এসেছে। লেকের দিকে চলেছে এখন।

বাস্তবে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মগজের মধ্যে গর্জে উঠল দানবটা: জলদি করো! সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে!

grohon.com

তেরো

ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে বারোটা বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট বাকি। লেকের পাড়ে পৌঁছে গেল কিশোর। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। মগজের দানবটা ভয়ানক খেপে গেছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে লাফিয়ে নামল কিশোর। দৌড় দিল বেড়ার দিকে। বেড়ার নিচের ফাঁকের কাছে এসে দাঁড়াল। আগের বার যেখান দিয়ে চুরি করে ঢুকেছিল।

বড় বড় ঘাস আর লতা সরিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল ফাঁকে। কাঁটাতারের খোঁচা লাগল কাঁধে। মনে পড়ল, কিশোর পাশার দেহের চেয়ে অফিসারের দেহ অনেক বড়, এই ফাঁক দিয়ে ঢোকাটা তার জন্যে বেজায় কঠিন। কিন্তু রূপ পরিবর্তন করতে গেলে এখন সময় নষ্ট হবে।

বড় শরীর নিয়ে অনেক খোঁচা সহ্য করে, অনেক রক্ত ঝরিয়ে অন্যপাশে চলে এল কিশোর। ঠোঁট কামড়ে ধরে ব্যথা সহ্য করল। হাঁপাতে হাঁপাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় তাকাল একটা জখমের দিকে। রক্ত বেরোচ্ছে। রূপালী রক্ত!

ঘড়ি দেখল কিশোর। সাড়ে-তিন মিনিট বাকি। রবিনরা কোথায়? জানে কোনখানে থাকবে। এই অফিসারের বেশে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। দৌড়াতে দৌড়াতেই প্রবল ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করতে থাকল সে কিশোর পাশা হওয়ার জন্যে।

*

মনে হতে লাগল, সেদিন মুসারা দেরি করে ফেলেছিল, আজ সে নিজে দেরি করে ফেলেছে। লেকের পানির ধারে কেউ নেই। একেবারে নির্জন।

ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে এখনও এক মিনিট বাকি। ভিনগ্রহবাসীরা কি বারোটার আগেই এসে তুলে নিয়ে গেছে ওদের?

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন কথা শোনা গেল ঝোপের ভেতর থেকে, 'কিশোর, আমরা এখানে!'

রবিনের কণ্ঠ।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন কিশোরের। রবিনরা আছে। ভিনগ্রহবাসীরা এখনও কোন ক্ষতি করতে পারেনি ওদের। আর সে নিজেও কিশোর পাশার রূপ নিয়ে ফেলেছে।

ঝোপের কাছে দৌড়ে গেল সে। গায়ে গা ঠেকিয়ে ভেতরে বসে আছে রবিন, মুসা আর জিনা।

'তোমার দেরি দেখে আমরা তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম,' রবিন বলল, 'তুমি আদৌ আসবে কিনা? আসার কথা মনে থাকবে কিনা!'

grohon.com

'তোমাকে দৌড়ে আসতে দেখেছি আমরা,' জিনা বলল। 'দূর থেকে মনে হলো তুমি নও, অন্য কেউ; তারপর দ্রুত যেন বদলে গিয়ে কিশোর হয়ে গেলে।...আরি, তোমার গায়ে পুলিশের পোশাক কেন?'

'তাই তো!' এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা লক্ষ করল রবিন আর মুসা।

গম্ভীর কণ্ঠে কিশোর বলল, 'ভুল দেখনি তুমি, জিনা। আমার মধ্যে একটা অলৌকিক ক্ষমতা জন্মেছে। নিজের দেহকে বদল করে অন্য যে কারও মত হয়ে যেতে পারি। পুলিশ অফিসারের রূপ ধরে আসতে হয়েছে আমাকে। সে অনেক কথা। এখন আর বলার সময় নেই। শুধু শুনে রাখো, আমি তোমাদের কারও জন্যেই নিরাপদ নই। আমি তোমাদের শত্রু। যে কোন মুহূর্তে ভয়ানক দানবে রূপ নিতে পারি আমি। তোমাদের ভয়ানক ক্ষতি করে দিতে পারি তখন।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে তিনজনে।

মুসা বলল, 'খাইছে! কি বলছ তুমি কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

'না পারার তো কিছু নেই। রিটা আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে, প্রমাণ করে দিয়েছে, আমাদের দেহে মস্ত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে ভিনগ্রহবাসীরা। তারপর সেটা আমি নিজের চোখেও দেখেছি।' আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। 'আজ রাত ঠিক বারোটায় একটা মাদার শিপ নেমে আসবে। তাতে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে আমাকে। সামনে পেলে তোমাদেরও নিয়ে যাবে, নয় মাস

আগে কিশোর পাশাকে যেমন নিয়ে গিয়েছিল। ভয়ানক একেকটা খুনী বানিয়ে ফেরত পাঠানো হবে পৃথিবীতে।'

'পুরো পাগল হয়ে গেছে ও!' জিনা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল মুসা।

'না, পাগল আমি হইনি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'বিশ্বাস করো! না করলে ভয়ানক বিপদে পড়বে তোমরা!'

মগজে ধমক মারছে দানব-মগজটা। কিন্তু দমিয়ে রাখল ওকে কিশোর-মগজ। তবে যে হারে খোঁচাচ্ছে, বেশিক্ষণ পারবে বলে মনে হলো না। দানবটা জিতে গেলেই সর্বনাশ!

আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। মেঘের স্তর দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। কোন্‌টার আড়ালে নামবে মাদার শিপটা? রঙিন ফানেল চোখে পড়ছে না এখনও।

রবিনদের দিকে তাকাল আবার কিশোর। 'বাঁচতে চাইলে এসো আমার সঙ্গে! জলদি করো!'

না না, ওদের যেতে দিও না!–ধমকে উঠল মগজের দানবটা। পস্তাবে বলে দিলাম!

পাত্তা দিল না কিশোর। বন্ধুদের দিকে তাকাল। 'দেরি করছ কেন? এসো! নইলে আর সময় পাবে না!'

'চলো, যাই ওর সঙ্গে!' সবার আগে উঠে দাঁড়াল জিনা। 'দেখাই যাক না সত্যি বলছে কিনা!'

দৌড় দিল কিশোর। স্বাভাবিকভাবে পা ফেলতে পারছে না। মনে হচ্ছে সীসা বেঁধে দিয়েছে কেউ তার পায়ে। বুঝতে পারল, দানবটা বিরোধিতা করাতে এমন হচ্ছে। কিন্তু থামল না সে।

grohon.com

ভিনগ্রহবাসী দানবের কাছে পরাস্ত হতে চাইল না।

রবিনদের নিয়ে পুলিশের গাড়িটার কাছে পৌঁছে গেল। অফিসারের চেয়ে ছোট শরীর নিয়ে ফোকর গলে আসতে বেগ পেতে হলো না এখন। ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকাল। বারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি। আকাশের দিকে তাকাল। এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ভুরু কুঁচকে গাড়িটার দিকে তাকাল রবিন, 'পুলিশের গাড়ি! কি করে জোগাড় করলে এটা?'

'বলার সময় নেই,' তাগাদা দিল কিশোর। 'গাড়িতে ওঠো!'

দানবটা যেন ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলেছে তার খুলির গায়ে। হৃৎপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে গেছে কিশোরের। আপ্রাণ চেষ্টা করেও দানবের সঙ্গে পেরে উঠছে না আর।

'জলদি করো! গাড়িতে ওঠো! একটা সেকেন্ডও দেরি কোরো না আর!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

হঠাৎ তার চোখের দিকে চোখ পড়তে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'খাইছে! ও সত্যি সত্যি দানব হয়ে গেছে! পালাও, জিনা! রবিন!'

চোদ্দ

সাইড-ভিউ মিররে নিজের চোখ দেখতে পেল কিশোর। আবার দুটো গোল ডিস্কে পরিণত হয়েছে।

'তুমি...তুমি...' কিশোরের দিকে তাকিয়ে গাড়ির কাছ থেকে সরে এল রবিন।

'আমি তো এতক্ষণ ধরে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি,' জবাব দিল কিশোর। 'আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। না পালালে তোমরাও মরবে। এই গাড়িটা নিয়ে শহরের দিকে চলে যাও...'

জিনা ভাবল, গাড়িতে চড়িয়ে তাদের বিপদে ফেলার চালাকি করছে কিশোরের ভেতরের দানবটা। কিশোরের মুখের কথা বিশ্বাস করতে পারল না। আচমকা ঘুরে আবার বনের দিকে দৌড় মারল সে। লেকের সীমানায় ঢুকে পড়াই নিরাপদ মনে হলো তার কাছে।

বেড়ার ফাঁক গলে আবার লেকের সীমানায় ঢুকে পড়ল সে। পেছনে ছুটল মুসা আর রবিন।

তিনজনই মরবে ওরা! একজনও বাঁচতে পারবে না! হাহাকার করে উঠল কিশোর-মগজ। কিছুই করার নেই আর এখন ওর।

grohon.com

দৌড়ে ধরে ফেলা ছাড়া।

বেড়ার ফাঁক গলে এসে সে-ও ছুটল ওদের পেছনে। ঝোপ, লতা, পচা পাতা, কাঁটাঝাড় ঠেলে, মাড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব। এপ্রিলের শীতল বাতাস যেন চিরে ঢুকছে ফুসফুসে। তীক্ষ্ণ পাথরের খোঁচায় পা হয়ে উঠছে রক্তাক্ত।

'দাঁড়াও!' হাপরের মত হাঁপাচ্ছে কিশোর। 'মাদার শিপটা...চলে আসবে...'

'কিসের মাদার শিপ! মিথ্যুক কোথাকার! আকাশে তো কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না!' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে জবাব দিল জিনা। সবার আগে চলে গেছে সে। তাকে কোনমতেই ধরা সম্ভব নয় আর কিশোরের পক্ষে।

জবাব দিল না কিশোর। একটাই চিন্তা এখন, ওদের ধরতে হবে। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করল সে। টের পেল পা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। চামড়ার রঙ হয়ে যাচ্ছে ফ্যাকাশে।

আবার ভিনগ্রহবাসীতে পরিণত হচ্ছে সে।

অসম্ভব দ্রুতগামী।

দ্রুত কমে আসতে শুরু করল আগে আগে ছুটতে থাকা তিনজন আর ওর মাঝের দূরত্ব। দৌড়ে ওদের ধরে ফেলাটা যেন আর কিছুই না এখন ওর জন্যে। পায়ের পেশিতে কোন টান নেই আর। সাবলীল গতিতে দৌড়াচ্ছে। উড়ে চলেছে যেন পা দুটো। অলিম্পিক গেমসের দৌড়বিদরা এখন ওকে দেখলে হাঁ হয়ে যেত।

সবচেয়ে পেছনে দৌড়াচ্ছে রবিন। তার পা সই করে ঝাঁপ দিল সে। গোড়ালি ধরে ফেলল। হুমড়ি খেয়ে নরম কাদামাটির ওপর

পড়ে গেল রবিন। 'রবিন, দোহাই তোমার, আমার কথা শোনো...'

গড়িয়ে গিয়ে চিত হলো রবিন। মুখ তুলে তাকাল। মুখে রাগ, ভয় দুটোই দেখা যাচ্ছে। 'ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে!' কিশোরের মুখে ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলল সে।

ঠিক এই সময় বিচিত্র একটা শব্দ শোনা গেল লেকের পানিতে। গলা বাড়িয়ে দিয়ে সেদিকে তাকাল রবিন। মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে যেন ওদের নিচ থেকে, জলাভূমির তলা থেকে।

'কিসের শব্দ?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রবিন।

তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল পর মুহূর্তে। কয়েক হাজার টন ইস্পাত যেন ছিটকে বেরিয়ে এল পানির নিচ থেকে। দানবীয় একটা রূপালী গুবরে পোকার পিঠের মত ভেসে উঠল। ধাতু আর স্ফটিকের মত পদার্থে তৈরি রঙিন জিনিসটা পানির কয়েক ফুট ওপরে উঠে ঝুলে রইল। উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে গা থেকে। অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু কিশোর-মগজ এখন জানে, ওই সুন্দরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কি ভয়ঙ্কর, মারাত্মক প্রাণীরা।

এটাই মাদার শিপ—বুঝে ফেলেছে সে। উত্তেজিত হয়ে উঠল দানব-মগজ। বলল, জয় তাহলে আমাদেরই হবে! ছেলেমেয়েগুলো পালাতে পারবে না। ধরে ওদের ফেলবই। আমাদের মিশন সফল হতে চলেছে।

ইউ এফ ও-টার দিকে তাকিয়ে আছে বিস্মিত রবিন। ঘুসি মারার কথা ভুলে গেছে। সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। ঘাড়ের পেছনে বাহু পেঁচিয়ে চাপ দিয়ে অবশ করে ফেলল তাকে। ওর কিশোর-মগজে একটা প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। সফল হলে বাঁচাতে

পারবে তিনজনকে। সেজন্যেই নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে রবিনকে। বাধা দিতে থাকলে পারবে না।

সরে এসে লেকের মাটির ওপরে থামল মাদার শিপের একটা ধার। গা থেকে ক্রমাগত বিচ্ছুরিত হচ্ছে আঁকাবাঁকা নীল বিদ্যুতের শিখা। শকওয়েভের ধাক্কায় থরথর করে কেঁপে উঠল মাটি। সরে গেল একটা হ্যাচের মত গোল ঢাকনা। নীল রঙের আলো যেন ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এল খোলা জায়গাটা দিয়ে।

উজ্জ্বল হ্যাচের ভেতর থেকে নেমে এল মস্ত একটা ধাতব মই। ধীরে ধীরে মাটিতে ঠেকল নিচের দিকটা। বিশাল পোকার শুঁড়ের মত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল যেন নিরাপদ কিনা। তারপর স্থির হলো। মাদার শিপের গ্যাঙওয়ে ওটা–অতি-অতি আধুনিক সিঁড়ি; যেখানে ইচ্ছে খোলা যায়, নামানো যায়, ছোট করা যায়, বড় করা যায়; শিপ থেকে যেখানে ইচ্ছে যাতে নামতে পারে এর যাত্রীরা। জরুরী অবস্থায় শিপটা যখন নড়তে থাকে, তখনও সিঁড়ি নামাতে কোন অসুবিধে নেই। বিশেষ ধরনের স্ট্যাবিলাইজার আছে সিঁড়িতে, যাতে শিপ নড়লেও ওটা স্থির থাকে, ওঠানামা করতে অসুবিধে না হয়।

মানুষের মত দুজন লম্বা লোক নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে। মাথাটা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বড়। কালো বড় বড় চোখ। সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামল শিকারী বিড়ালের ক্ষিপ্রতায়। নেমেই চোখে পড়ল কিশোরকে। এগিয়ে এল তার দিকে।

ওর মগজের দানব অংশ ওদের দেখে উল্লসিত হলো। কিশোর

অংশ শঙ্কিত। পরের কয়েকটা মিনিটেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। বোঝা যাবে, তিনজনকে বাঁচাতে পারবে কিনা।

কিশোরের দিকে তাকাল একজন ভিনগ্রহবাসী। কিশোরের দেহটা এখন ভিনগ্রহবাসী লোকটার মতই হয়ে গেছে। রবিনকে দেখিয়ে বলল লোকটা, 'এটাকে আটকে ফেলে ভাল কাজ করেছ,' হিসহিসে কণ্ঠস্বর। 'খুব খুশি হবে আমাদের লীডার। বাকিগুলো কোথায়?'

যা করার এখুনি করতে হবে! আর সময় নেই! ভাবছে কিশোর-মগজ।

'ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'গাড়ি আছে ওদের। মেইনরোডে উঠে গেলে আর ধরতে পারবেন না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দৌড় দিল দুজনে।

'ভুল দিকে দেখিয়েছ তুমি!' ফিসফিস করে বলল বিস্মিত রবিন। 'ব্যাপারটা কি? এ সব কি ঘটছে? আসলে তুমি কে, বলো তো?'

'ঠিক জানি না। তবে আমি সম্ভবত একজন ভিনগ্রহবাসী খুনী। কিশোর পাশার ছদ্মবেশে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশনে পাঠানো হয়েছিল আমাকে।'

'কিন্তু তাহলে আমাকে আর আমার বন্ধুদের বাঁচানোর চেষ্টা করছ কেন?'

'আমার মগজে প্রোগ্রামিং করার সময় নিশ্চয় ভজঘট করে ফেলেছে ওদের বিজ্ঞানীরা,' জবাব দিল কিশোর। 'ওরা ভেবেছে আমার মগজে কিশোর পাশার মগজের কোষ ঢুকিয়ে দিলে

grohon.com

grohon.com

ছদ্মবেশটা নিখুঁত হবে। হতো। কিন্তু কোষের পরিমাণটা সম্ভবত বেশি হয়ে গেছে। তাতে আসল খুনীর চেয়ে কিশোরের ইচ্ছেটাই কাজ করছে বেশি। সেই সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তিগুলোও।'

ভিনগ্রহবাসীর দেহে পরিণত হয়েছে এখন কিশোরের শরীর। পায়ের শক্তির মত কানের শক্তিও বেড়ে গেছে তাই। শুনতে পাচ্ছে দুই সহকর্মীর ছুটন্ত পদশব্দ। বুঝতে পারছে, খুব অল্পক্ষণের মধ্যে কিছুই না পেয়ে শৈলশিরার দিক থেকে ফিরে আসবে ওরা।

'যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে ওরা,' রবিনকে বলল কিশোর। 'মুসা বা জিনাকে খুঁজে না পেয়ে।'

উঠে দাঁড়াল রবিন। 'কি করতে বলো আমাকে? পালানোর উপায় কি? কোন বুদ্ধি বের করেছ?'

হাসল কিশোর। বিষণ্ণ হাসি। জানে, ভয়ানক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে নিজের ওপর। ভিনগ্রহবাসীরা যখন ধরে ফেলবে তার চালাকি, কি ঘটবে...ভাবতে চাইল না আর সে।

'জোরে কথা বলবে না,' সাবধান করল কিশোর। 'শুনে ফেলবে ওরা। যা বলি, মন দিয়ে শোনো।'

*

শৈলশিরার কাছ থেকে ফিরে এল দুই ভিনগ্রহবাসী। লেকের কিনারে এসে পড়ে থাকতে দেখল রবিনের অবশ দেহটা।

'তুমি!' চিৎকার করে উঠল একজন। 'তোমাকে যে ধরেছিল সে কোথায়?'

জবাব দিল না রবিন।

'কালা নাকি?' চিৎকার করে বলল দ্বিতীয়জন। 'কই, কোথায়

সেই ছেলেটা? আর তোমার বন্ধুরা? জলদি বলো। তাহলে ছেড়ে দেব।'

গুঙিয়ে উঠল রবিন। নড়ে উঠে নিথর হয়ে গেল তার দেহ। নেতিয়ে রয়েছে কাদায়।

'নিশ্চয় মারামারি করে কাহিল হয়ে গেছে,' প্রথমজন বলল। 'খুব পিটিয়েছে মনে হচ্ছে এটাকে।'

'জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করো এটাকে!' জরুরী কণ্ঠে তাগাদা দিল দ্বিতীয়জন। 'বাকি ছেলেমেয়েগুলো কোথায় আছে নিশ্চয় জানে ও।'

'জিজ্ঞেস করার সময় নেই আর,' প্রথমজনের কণ্ঠে উদ্বেগ। 'এখুনি চলে যেতে হবে আমাদের, নইলে যোগাযোগ মিস করব। ফিরে যেতে পারব না আমাদের জায়গায়। আর যেতে না পারলে...'

'ভয়ানক রেগে যাবে লীডার,' হিসহিস করে উঠল দ্বিতীয়জন। 'বরং যেটাকে পেয়েছি তাকেই নিয়ে যাই। লীডার খুশি হবে।'

'কেন, খুশি হবে কেন?'

'চিনতে পারছ না? চেহারাটা কেমন চেনা চেনা লাগছে না?'

'গ্যারিলির ছেলে না তো!'

খসখসে হাসি হাসল দ্বিতীয়জন, 'সে-রকমই লাগছে।'

'তাহলে তো খুবই ভাল। একে পেলে সত্যি খুশি হবে লীডার। চলো, চলো, নিয়ে চলো। দেখি, মাথার দিকটা ধরো তুমি।'

ছেলেটাকে তুলে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত সিঁড়ির কাছে বয়ে

নিয়ে এল দুজনে। ওপরে তুলল। মহাকাশযানের ভেতরে এনে ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত লম্বা একটা মোটা প্লাস্টিকের টিউবের মধ্যে ভরল তাকে। নিথর দেহটা খাড়া হয়ে রইল টিউবের মধ্যে।

চলে যেতে যখন তৈরি হলো ভিনগ্রহবাসীরা, তখন চোখ মেলল ছেলেটা।

কোটরের জায়গায় কালো দুটো ডিস্ক।

শেষবারের মত দেহ-রূপান্তর ঘটিয়েছে সে। ওরা তাকে রবিন ভেবে, গ্যারিলির ছেলে ভেবে, মেডিক্যাল টিউবে ভরে রেখেছে। চালাকি ধরতে পারেনি। বোকা বনেছে।

একটা ইন্টারকমের মত জিনিসে প্রথম ভিনগ্রহবাসী বলল, 'কমান্ড ওয়ান, মাদার শিপ থেকে বলছি। আমাদের কাজ শেষ।'

'এজেন্ট নিমোর খবর কি?' স্পীকারে খড়খড় করে উঠল আরেকটা কণ্ঠ।

'এজেন্ট নিমো...ওকে ফেলে আসতে হয়েছে,' জবাব দিল দ্বিতীয় ভিনগ্রহবাসী। ওর কণ্ঠের শঙ্কা টিউবের ভেতরে থেকেও কান এড়াল না রবিনরূপী কিশোরের। মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে।

এই প্রথম জানতে পারল ও, ওর আসল নামটা কি। এজেন্ট নিমো।

ভাবছে কিশোর: না না, নিমো—ওদের নিচে এখন কোথাও রয়েছে সত্যিকারের রবিন, মুসা আর জিনা। হয়তো বনের মধ্যে ঘাপটি মেরে রয়েছে ওরা। ইউ এফ ও-টা অদৃশ্য হয়ে গেলে গিয়ে গাড়ির ট্রাংক থেকে পুলিশ অফিসারকে মুক্ত করবে। থানায় যাবে। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে বোঝাতে অনেক বেগ পেতে হবে

grohon.com

ওদের।

রকি বীচ শহরটার কথা মনে পড়ল নিমোর কিশোর-মগজের। হাহাকার উঠল মনের মধ্যে। চাচা-চাচীর কথা ভেবে মোচড় দিয়ে উঠল বুক। চোখ নেই, চোখের জায়গায় ডিস্ক, তাই পানি এল না। প্রতিজ্ঞা করল, আবার ফিরে আসবে পৃথিবীতে। আসল কিশোর পাশার দেহ এবং সম্পূর্ণ মগজ নিয়ে। যদি দেহটা রেখে দিয়ে থাকে ওরা!

***

Grohon || Adhare Alor pothojatri